জীবনযাপন

সমরেশ মজুমদার

সাহিত্য সংস্থা ১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

মুদ্রণে :
এম. এম. প্রিন্টার্স
৩৫, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৫

১

সকাল নটায় স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়াল হরিপদ। একেবারে পা থেকে মাথা ছাড়িয়ে যাওয়া এই আয়নাটা ছিল পিতামহের। পৈত্রিক সূত্রে সে ওই খাটের সঙ্গে আয়নাটা পেয়েছে। একেবারে বেলজিয়ামের কাচ। মিথ্যে বলে না।

তোয়ালে পরা নিজের শরীরটাকে সে ভাল করে দেখল। কোথাও ফালতু ভাঁজ নেই, একেবারে টানটান চামড়া। এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই শরীরে, গত পনের বছরে কোমরের মাপ একই জায়গায় থেকে গিয়েছে। নিজের মুখ আয়নার কাছে নিয়ে গিয়ে দেখল সে। কোথাও রেখা তৈরি হয়নি, চোখের তলায় আধাবৃত্ত, অথবা চিবুকের ডগা শুকনো এমন কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। মাথার চুল যেমন ঘন ছিল বিশ বছর আগে এখনও তেমনই আছে। দেখে কে বলবে সে আজ পঞ্চাশে পা দিল। পঞ্চাশ। ছেলেবেলায় এই বয়সটার কথা কেউ বললে বার্ধক্যের কথা মনে হত। অথচ সে এখন তার পঞ্চাশ বছরের শরীরটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় দেখে তার চিহ্ন মাত্র খুঁজে পেল না। বুক ফুলিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে।

হরিপদ কোনকালে ব্যায়াম করেনি। খেলাধুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্কুলের পর চুকেছে। অবশ্য রোজ তিন-চার মাইল হাঁটাটাকে যদি ব্যায়াম বলা হয় সেটা অন্য কথা। সে হাঁটে জীবিকার প্রয়োজনে। ব্যায়াম যারা নিয়মিত করে তাদের শরীরে কাঠখোট্টা ভাব এসে যায়। হরিপদর তা আসেনি। আর এইটে হয়েছে একটা সমস্যা।

হরিপদর সহপাঠীদের চেহারা পঞ্চাশে যেমন হওয়া উচিত তেমন হয়েছে। কারো চোখের তলায় মাংসের ঢিবি, কারো মুখ শুকিয়ে কিসমিস, কারো টাক পড়েছে কেউ বিরাট ভুঁড়ির কারণে প্যান্ট

পরা ছেড়ে দিয়েছে। এদের কারো কারো ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ দাদু হয়েছে আবার কেউ মেয়ের বিয়ের জন্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই হরিপদর তুইতোকারি সম্পর্ক। কিন্তু এখন হরিপদকে দেখলেই এরা অস্বস্তিতে ভোগে, হরিপদরও ভাল লাগে না। সে কেন বুড়ো হচ্ছে না এই অভিযোগ আর চাপা থাকছে না। সেদিন এক বন্ধুর স্ত্রী, যার মাথার চুলের তিরিশ ভাগ সাদা জিজ্ঞাসাই করে ফেলেছিলেন, 'আপনি এত সুন্দর কলপ কোত্থেকে করান?'

হরিপদ মাথা নেড়েছিল, 'আমার চুল পাকেনি, কলপ করব কেন?'

মহিলার চোখ থেকে সন্দেহের ছায়া তবু সরেনি। সেটা ঢাকতেই তিনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিলেন, 'কি জানি বাবা, এমন কার্তিক সেজে এই বয়সে কি করে থেকে গেছেন।'

বন্ধু মাথা নেড়েছিল, 'ভাল, ভাল, তবে কি না প্রতিটি বয়সের একটা আলাদা সৌন্দর্য তো আছে।'

হরিপদ ঠিক করেছিল ওই বাড়িতে আর কখনও যাবে না। ফলে তার বন্ধুর সংখ্যা কমে যাচ্ছিল হু হু করে। পঞ্চাশে এসে পঁয়-ত্রিশের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব হয় না। কিন্তু আলাপ হবার পর পঁয়ত্রিশের অনেকেই তাকে তুমি তুমি করে কথা বলেছে, নাম ধরে ডেকেছে। ভুল ভাঙায়নি হরিপদ কিন্তু অস্বস্তিতে ভুগেছে।

নীল রঙ ওর ভারি পছন্দ। চামড়া একটু ফর্সার দিকে হওয়ায় নীল সার্ট তার শরীরে ভাল খোলে। যত্ন করে চুল আঁচড়ে নীল সার্ট পরতেই দরজা থেকে গলা ভেসে এল, 'ওঃ, দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে। ফ্যান্টাস্টিক!'

চিরুনি তুলতে তুলতে দরজার দিকে তাকিয়ে চোখ ছোট করল হরিপদ, 'শাড়ি পরেছিস কেন?'

'আজ সমস্ত বন্ধুরা শাড়ি পরে যাবে, কলেজে ফাংশন আছে।' বলতে বলতে তনিমা মোটা বেণীটাকে সামনে নিয়ে এল।

হরিপদ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল। শাড়ি পড়লে মেয়েটাকে আচমকা বড় দেখায়। এমনিতেই লম্বা তার ওপর শাড়ি। যা বয়স তার চেয়েও বেশি। সে বলল, 'তুই নিচে নাম, আমি আসছি।' বলতে বলতেই চুল আঁচড়ানো শেষ। এবার একটু আতর মাখবে সে। নাখোদা মসজিদের পাশে এক বৃদ্ধ আতর বিক্রি করেন। মৃগনাভি থেকে তৈরি এই আতর হরিপদ কিনেছিল অনেক দামে। খুব কৃপণের মত মাখে সে। আজ দরকার তাই মাখছে।

সেটা দেখতে পেয়ে মেয়ে চলে এল কাছে, "বাবা, আমি একটু মাখব।'

'তোদের তো ভাল পারফিউম আছে।' আপত্তি জানাল হরিপদ।

'থাকুক। এই আতরটার গন্ধই আলাদা।' আপত্তি করার সুযোগ বেশি দিল না মেয়ে। হাত থেকে শিশি কেড়ে নিয়ে রুমালে ঢালল। হরিপদ দেখল মেয়ে তার চিবুক ছুঁয়েছে। বিজ্ঞাপন দিতে হলে সুন্দরী তন্বী স্বাস্থ্যবতী লিখতে হবে। তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। এই তো কিছুদিন আগে ফ্রক পরত। তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে গল্প করত। একেবারে ছেলেবেলা থেকে ওদের একটা অভ্যেস তৈরি হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় হয় মেয়ে নয় সে পরস্পরকে হাম খেয়ে যাবে। একটি দিনের জন্যে সেটা বন্ধ হয়নি। প্রথম দিকে সন্ধ্যা কিছু বলত না। বরং সে বাড়ি থেকে যখন বের হত তখন মেয়েকে ডেকে দিত। বছর চারেক হল তার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে ব্যাপারটা পছন্দ করছে না। তবে হাম খাওয়ার ধরনও পাল্টেছে। আগে মেয়ে হাম খেত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, আজকাল কোনমতে গাল ছোঁয়। তবু তো ছোঁয়।

সন্ধ্যা রান্নাঘরে ছিল। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তনিমা চিৎকার করল, 'মা, আমরা রেডি।' সন্ধ্যার সাড়া পাওয়া গেল না। কাজের

মেয়েটি খাওয়ার টেবিলে জল দিয়ে গেল। ওরা বসল মুখোমুখি, কাজের দিনে এই সময় ভাত খায় না হরিপদ, তার দেখাদেখি মেয়েও ভাত ছেড়েছে। এটা মোটেই পছন্দ নয় সন্ধ্যার। তার অনেক কিছুই অপছন্দ তার। আর এই সব পুষে রেখে সংসারে একসঙ্গে থাকার নাম জীবনযাপন। তনিমা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কোন স্পেশ্যাল ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে!'

'হুঁ। একটা কন্ট্রাক্ট পাওয়ার কথা। যে কোম্পানি দেবে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর একজন খিটখিটে মহিলা বলে শুনেছি। টেন্ডার দিয়েছিলাম, ডেকে পাঠিয়েছেন। মাথা নাড়ল হরিপদ, 'ব্যবসার অবস্থা তো মোটেই ভাল নয়। কম্পিটিশন যত বাড়ছে তত মানুষ দু নম্বরী কারবার করে কাজ হাতাচ্ছে। কি ভাবে যে টিকে থাকব জানি না।'

তনিমা হাসল, 'তোমার ব্যবসা করতে আসাই ভুল হয়েছে।'

খাবারের প্লেট নিয়ে সন্ধ্যা টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সেই কথার সূত্র ধরল, 'সারাজীবন কথাটা আমি বললাম, কানে নেয়নি। তুই বললে যদি হয়।'

হরিপদ হাসল, 'এই বয়সে ব্যবসা ছাড়লে কেউ তো আমাকে চাকরি দেবে না।'

কথাটা শোনামাত্র দুজনেই চুপ করে গেল। খেতে খেতে তনিমা শেষপর্যন্ত মুখ খুলল, 'তুমি যাই বলো, তোমার বয়সে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এমন দেখতে ছিলেন না!'

চোয়াল থামাল হরিপদ, 'কথাটা উঠল কেন?'

'আমার মনে পড়ল। যেদিন তুমি আমাকে প্রথম কলেজে পৌঁছাতে গিয়েছিলে সেদিন সবাই তোমাকে আমার দাদা বলে ভুল করেছিল। পরে আমি বয়স বললে কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। নীতা এমন পাজি যে বলে, তোর স্টেপ ফাদার। আমাদের সঙ্গে পড়ে একটা মেয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশে থাকে। সে

বলল ওই বয়সে পৌঁছে উনি আর নায়ক করতেন না কিন্তু তুমি ফিল্ম করলে মোটেই বেমানান মনে হত না।' তনিমা বলে গেল।

'ওইটেই বাকি আছে।' সন্ধ্যা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হরিপদ স্ত্রীর দিকে তাকাল। একসঙ্গে দীর্ঘদিন থাকলে মানুষের চেহারার পরিবর্তন চট করে ধরা যায় না। কিন্তু আজকাল সন্ধ্যাকে বয়সের চেয়ে অনেক বয়স্কা বলে মনে হয়। নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে একবার কলপ করা সত্বেও কানের পাশে সাদা ঝিকমিক করে তিনদিন গড়াতেই। যেহেতু সন্ধ্যা তার চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট তাই আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালি মহিলার মত তার শরীর সম্পর্কে উদাসীনতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। লিভারের গোলমাল শুরু হয়েছে আর সেই সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের সব কটি লক্ষণ ফুটে উঠেছে একের পর এক। চুলে কলপ দিচ্ছে তনিমার চাপে পড়ে। আর সেটা এখন দাসত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

সন্ধ্যা সচরাচর তার সঙ্গে বের হয় না। এ ক্ষেত্রেও একই অভিজ্ঞতা। রাসবিহারীর মোড়ে এক সন্ধ্যায় ওদের যেতে হয়েছিল পারিবারিক প্রয়োজনে। সেখানে সন্ধ্যার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। স্কুল ছাড়ার পর আর যোগাযোগ হয়নি। মহিলা এখন দারভাঙ্গায় থাকেন। বেশ গিন্নীবান্নি চেহারা। কি করে যে ওরা পরস্পরকে চিনতে পারল সেটাই বিস্ময়ের। দুই বন্ধু দুজনের হাত ধরে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে দেখে হরিপদ খানিকটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কানে এল বন্ধু সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ভদ্রলোক কে রে? তোর ভাই?'

মুখ ফেরাতেই সন্ধ্যার সঙ্গে চোখাচোখি হল। এক রাশ অন্ধকার নেমে এসেছে। এবং সে সঠিক জবাব দিতেই মহিলা বলে উঠলেন, 'যাঃ। বিশ্বাস হয় না। কি ব্যাপার বল তো?'

কিছুটা অভদ্রের মত সন্ধ্যা কথাবার্তা আচমকা শেষ করে কাজের অজুহাতে চলে এসেছিল। এমনকি হরিপদর সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়

করিয়েও দেয়নি। ফেরার পথে থমথমে মুখ নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকে ফেটে পড়েছিল, 'আর কখনো আমি তোমার সংগে যাব না।'

হরিপদ বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চেয়েছিল, 'আমার অপরাধ কোথায়?'

'তোমার সংসারে আমাকে বিনা মাইনের ঝি করে এনেছিলে। খাটতে খাটতে শরীরের এই হাল হয়ে গেল। যা বয়স তার থেকে বুড়ো দেখায়। আর উনি এখনও তরুণ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পাঁচজনের সামনে আমাকে ছোট না করলে আনন্দ হয় না!'

'তুমি কিন্তু মিছিমিছি আমাকে দোষ দিচ্ছ।'

'মিছিমিছি? তুমি আমাকে শেষ কবে আদর করেছ বল তো? মনে পড়বে না। আমি বুড়ি, আমাকে ছোঁবে কেন? গায়ে আতর মেখে কি জন্যে বের হও বুঝি না ভেবেছ। যার অত বড় মেয়ে তার কচি সেজে থাকা মানায় না।'

কথা বাড়ায়নি সেদিন হরিপদ। সন্ধ্যার মেজাজ যখন গনগনে হয় তখন কোন প্রতিরোধ সহ্য করতে পারে না। আবার প্রতিরোধ না পেলে সেটা মিইয়ে যেতে বেশি দেরিও হয় না।

হরিপদর একটি গাড়ি আছে। গাড়িটি সে কিনেছিল পঁচিশ হাজার টাকায়। পঁচিশ বছর বয়সও হয়েছে গাড়িটির। সে নিজেই চালায়। পকেটে তেল কেনার টাকা অথবা বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া গাড়ি বের করে না। হরিপদ খুব সাবধানী চালক। ফাঁকা রাস্তাতেও সে চল্লিশের ওপর স্পীড তোলে না। তার ব্যবসার কাজে গাড়িটি খুব সাহায্য করত একসময়। এখন ব্যবসা যেভাবে পড়ছে তাতে গাড়িটা রাখাই দায় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিক্রি করতে চাইলেও করা যাবে না। দালাল বলে গিয়েছে দশ হাজারের বেশি পাওয়া যাবে না। ওতে রাজি হওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

তনিমা দাঁড়িয়েছিল। গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করতে সময় লাগে হরিপদর, আজও লাগল। দরজা খুলে দিতেই তনিমা উঠে

বলল, 'বাবা, এবার গাড়িটা বিক্রি কর। এমন বুড়ো গাড়ি আজকাল কেউ রাখে না।'

হরিপদ জবাব দিল না। বুড়ো হলেই যদি বাতিল করার কথা ওঠে তাহলে যে অনেক কিছু করতে হয়। এসব তনিমার বয়সের ছেলেমেয়ে কিছুতেই বুঝবে না। কলেজের সামনে গাড়ি থেকে নামার আগে তনিমা আচমকা পঞ্চাশটা টাকা চাইল। রেগে গেল হরিপদ, 'কদিন আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। হিসেব চাইছি না বলে যখন ইচ্ছে টাকা চাইলেই যদি ভাব পেয়ে যাবে তাহলে ভুল করছ।'

'তুমি খুব রেগে গেছ। রাগলে আমাকে তুমি বল।' হাসল তনিমা।

'টাকা তুই পাবি না। আমার টাকার গাছ নেই।' গলা নামাল হরিপদ, 'তিন মাস কোন রোজগার নেই অথচ কেউ সেটা ভাববি না তোরা।'

'সরি। যাচ্ছি।' তনিমা দরজা খুলে নেমে কলেজের ভেতরে চলে গেল। গিয়ার চেঞ্জ করতে গিয়ে থেমে গেল। অন্তত এবারের মত টাকাটা দিয়ে সে তনিমাকে উপদেশ দিতে পারত। পঞ্চাশটা টাকা সে এখনই দিলে তেমন অসুবিধেয় পড়বে না। গাড়িটা পার্ক করে হরিপদ কলেজের গেট পেরিয়ে দুপাশে তাকাল। বাঁ দিকে অফিস ঘর। তার সামনে কিছু ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে তনিমা নেই। এর মধ্যে সে অনেকের চোখে পড়ে গেছে। দুটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে তাকে দেখছে। সে মেয়ে দুটোর দিকে এগিয়ে গেল, 'শোন ভাই, আমার মেয়ে তোমাদের কলেজে পড়ে। ওর নাম তনিমা। এইমাত্র ভেতরে ঢুকেছে। ওকে চেন?'

একটি মেয়ে বিস্ময় লুকোতে পারল না, 'আপনি তনিমার বাবা?'

'হ্যাঁ। চেনো ওকে?' আবার অস্বস্তিটা শুরু হল হরিপদর।

মেয়েকে টাকা দিয়ে কলেজ থেকে বেরুতে পেরে বেঁচে গেল যেন সে। একগাদা ছেলেমেয়ে তার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছে যে মনে হয়েছে চেহারায় বার্ধক্য এলে ভাল হত। গাড়ি চালিয়ে অফিসে আসতে যেটুকু সময় একা থাকতে পারল হরিপদর তাতেই মন কিছুটা হাল্কা হল। এইটেই ওষুধ। সে যখন তার পরিবার অথবা বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাকে, একা অথবা সদ্য পরিচিত মানুষদের সঙ্গে সময় কাটায় তখন মেজাজ বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়।

হরিপদর অফিস দু' কামরার। একটাই বড় ঘর পার্টিশন করে নেওয়া। এখন এই ধর্মতলা পাড়ায় এমন ঘর নেওয়ার ক্ষমতা তার হত না। অনেকদিনের অফিস এবং তাও একজনের অনুগ্রহে পাওয়া বলেই সে করে খাচ্ছে। মোট তিনজন কর্মচারী তার। এদের মাস মাইনের ব্যবস্থা করতে প্রাণ হিমসিম খাচ্ছে মাঝে মাঝে। অথচ এর কম কর্মচারী নিয়ে ব্যবসা করা চলে না। নিজের চেম্বারে ঢুকে সে টেবিলে চাপা দেওয়া দুটো খাম দেখল। একটা ফালতু ব্যাপার অন্যটি তবু মন্দের ভাল। মাস তিনেক আগে একটা কাজ করেছিল, বিল দিয়েও পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটি পাশ হয়েছে, চেক নিয়ে আসতে লিখেছে।

জল খেয়ে ড্রয়ার খুলে কাগজটা বের করল সে। গতকাল হিসেবটা করেছিল। মাস গেলে সবরকম বাদ-ছাদ দিয়েও তার অন্তত নয় হাজার টাকা দরকার। লাখ টাকার ওপরে বছরে। প্রথম দিকে এটা কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু আগামী মাস-গুলোতে কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। অর্থচিন্তা মানুষকে ভেঙে ফেলে। এমন চললে সে বুড়ো হয়ে যাবে অচিরেই। হরিপদ স্থির করল যেমন করেই হোক আজ ওই অর্ডারটা পেতেই হবে। টাকার অংকটা মোটা। কাজটা পেলে অন্তত মাস ছয়েকের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে সে কিভাবে সন্তুষ্ট করবে? কাগজপত্রে সে যতটা সম্ভব কম লাভ রেখেছে। পাস্ট

রেকর্ড দেখতে চাইলে সে অনেক কিছু দেখাতে পারে। কিন্তু তাতে কতখানি কাজ হবে?

অনেক ভেবেচিন্তে সে অরবিন্দ ঘোষালের নাম্বারটা ঘোরাল। অরবিন্দ ঘোষাল তাদের সহপাঠী, ভাল ছেলে ছিল, আই আর এস পাশ করে আয়কর বিভাগের বড় কর্তা হয়েছে। হরিপদর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এখনও। তার প্রধান কারণ হরিপদ আজ অবধি কখনও অরবিন্দ ঘোষালের কাছে আয়কর সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে দরবার করেনি। যতটুকু ফাঁকি দেওয়া সম্ভব দিয়ে বাকিটার কর সে দিয়ে দেয় সময়মত। আয়কর বিভাগ মেনেও নেয়। টেলিফোন ধরলেন অরবিন্দ, নাম শুনে খুশি হলেন, 'কি হে, সাত সকালে সরকারি অফিসারকে খুঁজছ! ব্যাপারটা কি?'

ভনিতা না করে সমস্যাটা বলল হরিপদ। বলে জানতে চাইল কিছু সরাহা আছে কি না! কলকাতার সমস্ত বড় কোম্পানির কর্তাদের অরবিন্দ কাজের সূত্রে মোটামুটি চেনেন। কোম্পানির নাম শুনে অরবিন্দ বললেন, 'না ভাই। নো হোপ। ভদ্রমহিলাকে আজ পর্যন্ত কেউ অ্যাসেস করতে পারেনি। শুনেছি শী ইজ ম্যানহেটার।'

শুনতে ভুল করল হরিপদ, 'কি? ম্যান ইটার?'

'ওঃ, কানের মাথা খেয়েছ নাকি? তবে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রমশাই এমন বাঘিনী পেলে কতটা খুশি হবেন তা জানি না। ইনি ম্যানহেটার। পুরুষমানুষকে দুচোখে দেখতে পারেন না। সুবিধেবাদী স্বার্থপর জীব বলে মনে করেন।'

'তাহলে?' ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গেল হরিপদর গলা।

চান্স নিতে পার। চেহারা তো এখনও লালটু রেখেছ। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের মহিলার মনে রোমান্টিসিজম আসবে না এমন কথা কি বলা যায়?

'একটা পথ বল অরবিন্দ। ইয়ার্কি ভাল লাগছে না।'

কিছুক্ষণ ভাবল অরবিন্দ। তারপর হাসল, 'শুনেছি মহিলা ভুবনমোহিনীর শিষ্যা। নাম শুনেছ তো? গুড। ঘরে ঢুকে দেখবে তাঁর ছবি আছে কি না। দেখতে পেলে যদি কোন কথায় বলে দিতে পার তুমিও মা ভুবনমোহিনীর শিষ্য তাহলে কেস পাল্টে যেতে পারে।'

'কিন্তু আমি তো শিষ্য নই।'

'হয়ে যেতে কতক্ষণ! মা ভুবনমোহিনী পাইকারি হারে দীক্ষা দেন।'

'কিন্তু আমি তো ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না!'

'অদ্ভুত লোক তো তুমি? দেশের মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অভিনেতা পর্যন্ত ওঁর পায়ের তলায় পড়ে আছে আর তুমি বলছ কিছু জানো না?'

'জানি মানে খবরের কাগজে যা পড়েছি সেটুকুই।' হরিপদ সংশোধন করল।

'ব্যস, তাতেই চলবে। বাকিটা ওঁর জীবনী কিনে পড়ে ফেল। যদি কেস ঝুলে থাকে তাহলে আমাকে জানিও আমি মা ভুবনমোহিনীর এক শিষ্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব যিনি তোমার দীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।'

'দীক্ষা? আমি দীক্ষা নেব?' আঁতকে উঠল হরিপদ।

'এক পয়সা খরচ নেই শুধু আশ্রমের চাঁদা দেওয়া ছাড়া। এত অল্প ইনভেস্টমেন্টে কত বড় ব্যবসা হাতড়াবে ভাবতে পার? তোমরা তো অর্ডার পাওয়ার জন্যে ইনকামট্যাক্সে খরচা দেখাও, দেখাও না?'

লাইন ছেড়ে দিয়েছিল অরবিন্দ। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল হরিপদ। তারপর তার পিওনকে ডাকল, 'শোন, আমাদের অফিসে কেউ মা ভুবনমোহিনীর শিষ্য আছে?'

পিওনটি হাত কচলালো, কান চুলকালো, 'আজ্ঞে আমি।'

'তুমি'? বিস্ময় লুকোলো না হরিপদ। সে ঘুণাক্ষরে জানত না।

'আজ্ঞে। ওঁর কাছে দীক্ষা নেবার পর মনে শান্তি এসেছে স্যার।'

'তুমি দীক্ষা নিয়েছ বোঝা যায় না তো।'

'বুঝবেন কি করে? মা বলেছেন চব্বিশঘণ্টা পুজো করতে হবে না। ঘুমুতে যাওয়ার আগে তিনবার মা মা মা করতে হবে আর ঘুম থেকে উঠে পাঁচ মিনিট মায়ের ছবির সামনে মৌন হয়ে বসতে হবে। আর এই যে,' সার্টের বোতাম খুলে পিওন একটা পেতলের হারের সঙ্গে গাঁথা লকেট বের করল, 'মায়েব ছবি, অষ্টপ্রহর মাকে আমি বুকে করে রেখেছি যাতে কোন বিপদ না হয়।'

হরিপদ দেখল ছবিটা। মধ্যবয়সী এক সুন্দরী মহিলা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। মহিলার মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুল। পিওনটি বলল, 'এটি মায়ের অল্প বয়সের ছবি। তা প্রায় চল্লিশ বছর তো হবেই। তবে এখনও যদি মায়ের সামনে যান চোখ মন জুড়িয়ে যাবে।'

হরিপদ আর কথা বাড়ায়নি। শুধু জেনে নিয়েছিল ওই রকম লকেট ধর্মতলা স্ট্রিটের কোন দোকানে পাওয়া যায়। কাগজপত্র নিয়ে সে সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল। পথে গাড়ি থামিয়ে সেই দোকানে গেল সে। লকেট হারসুদ্ধ পেতে দেরি হল না। একটু মূল্যবান হার এবং লকেট নিল যাতে দূর থেকেই ছবিটাকে চেনা যায়। গলায় পরে নিয়ে আপাতত লকেটটাকে জামার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। অরবিন্দ যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে এ ছাড়া উপায় নেই।

ভদ্রমহিলা খুব খিটখিটে বলে শুনে এসেছে এতদিন। চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আজ বড়বাবুর কাছে আগে গেল সে। সরকারি অফিসের বড়বাবুদের যে ক্ষমতা থাকে ওঁর তা নেই।

কিন্তু এঁকে হাতে না রাখলে পরবর্তী পর্যায়ে অসুবিধে হবে। প্রৌঢ় বললেন, 'ম্যাডামের কোন টেন্ডারই মনে ধরেনি, এটুকু বলতে পারি। তবু আপনাকে নিয়ে তিনজনকে ডেকেছেন।'

'কি করে কাজটা পাওয়া যায়?'

'ম্যাডামকে বলুন রেট কমাবেন।'

'কমাবো? তাতে তো ঘর থেকে দিতে হবে।'

ডাক এলে মন খারাপ করেই ভেতরে ঢুকল হরিপদ। হ্যাঁ, সুন্দরী ছিলেন এককালে। এখনও কায়দা ফায়দা সব ঠিকঠাক আছে। ঢোকামাত্র ঠায় চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আঙুলে ধরা কলম নেড়ে বসতে বললেন।

বসতে বসতে হরিপদ ঘরের চারপাশে নজর বোলালো। কোন ছবি নেই। ভদ্রমহিলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই হাইরেট কোট করলে আমরা আপনাকে ব্যবসা দেব কি করে ভাবলেন? কত বছর ধরে ব্যবসা করছেন?'

হরিপদ হাসার চেষ্টা করল, 'তা অনেকদিন হয়ে গেল। তিরিশ হতে বেশি দেরি নেই।'

'হোয়াট?' চোখ বড় করলেন মহিলা, 'আপনি কি দশ বছরে ব্যবসায় নেমেছেন?'

ঠিক তখনই মহিলার সামনে কাঁচের তলায় মা ভুবনমোহিনীর ছবি দেখতে পেল সে। দেখেই বুক টিপ টিপ করতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেল। মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিথ্যে কথা বলার সময় হিসেব করেন না কেন?'

মাথা নাড়ল হরিপদ কোনমতে, 'মিথ্যে নয় ম্যাডাম। মায়ের কৃপায় বয়সটা বোঝা যায় না আমার। মায়ের আশীর্বাদেই এখনও এরকম আছি।'

'মা, মানে?' চোখ ছোট হল মহিলার।

'মা ভুবনমোহিনী।' মৃদু গলায় জবাব দিল হরিপদ।

'আপনি মায়ের শিষ্য নাকি?' গলার স্বর কেমন পাল্টে যাচ্ছে মহিলার। জামার ভেতর থেকে লকেটটা বের করল হরিপদ, ওঁকে সবসময় সঙ্গে রাখি।'

'হুম্। আপনি আশ্রমে যান?'

'যাই ম্যাডাম।'

'আশ্চর্য। আপনাকে কখনও দেখিনি তো? কতদিন দীক্ষা নিয়েছেন? আমি, আমিও মায়ের শিষ্যা। ওঁর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমার জীবন পাল্টে গেল। জানেন?'

হরিপদ মাথা নাড়ল, 'একই অভিজ্ঞতা আমারও। মায়ের অনুগ্রহে অনেক উপকৃত হয়েছি। আমাদের বংশের সবাইকে উনি খুব ভালভাবে চেনেন। আসলে মায়ের নির্দেশমত পথে জীবনযাপন করছি বলে শরীরে বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি।'

মহিলা বললেন, 'মা তো কোন বিশেষ নিয়ম পালন করতে বলেননি!'

হরিপদ মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিল। আগ বাড়িয়ে ফালতু কথা বলার কি দরকার ছিল? মাথায় কিছু না আসায় সে বলল, 'মা বলেছেন শুদ্ধজীবন যাপন করতে।'

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই।'

'আমি তাই করছি।'

'কিরকম? ব্যবসা করছেন শুদ্ধভাবে?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। লাভের জন্যে মিথ্যে আচরণ করি না। যে কাজটা করি তা সৎভাবে করার চেষ্টা করি। যখনই সময় পাই তখনই মায়ের উপদেশগুলো নিয়ে ভাবি।'

'খুব ভাল লাগল। ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করা যায়। আপনি যেতে পারেন।'

দুদিন পরে এক কাজের দিনে পিওনটিকে নিয়ে হরিপদ গেল মা ভুবনমোহিনীর আশ্রমে। তিনি সাধারণত সকাল নটা থেকে এগারটা পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে থাকেন। হরিপদর ধারণা ছিল না ওখানে অমন ভিড় দেখতে পাবে। মাইকে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে। পিওনটি আগের দিন নাম লিখিয়ে এসেছিল হরিপদর। আজ স্বেচ্ছাসেবকদের ম্যানেজ করে হরিপদকে নিয়ে ভিড় সরিয়ে যেখানে পেঁছাল সেখানে সেই বিরাট হলঘরের একপ্রান্তে মা ভুবনমোহিনী বসে আছেন সিংহাসনে। মুখে স্বর্গীয় হাসি। তাঁকে ঘিরে আছে ভক্তজনেরা। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক একটা লম্বা দড়ি মায়ের পাশে বসে পাকিয়ে যাচ্ছে। দড়িটা এত মোটা যে দুহাতে ধরতে হবে। তার অন্য-প্রান্ত চলে এসেছে দরজা পর্যন্ত। নাম ডেকে ডেকে সেই ঘরে ঢোকানো হচ্ছে। পিওনটি দরজা পর্যন্ত এসে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এইসময় একজন স্বেচ্ছাসেবক ঘোষণা করলেন, 'যাঁরা দীক্ষা নিতে চান তাঁরা এই দড়ি স্পর্শ করে দাঁড়ান, মা আপনাদের দীক্ষা দিচ্ছেন।' স্তোত্র পাঠ থেমে গেল। হবু শিষ্যরা তড়িঘড়ি করে দড়ির স্পর্শ পেতে চাইল। হরিপদ দড়ি ধরল। মা ডান হাতটি দড়ির ওপরে রাখলেন। এবার মাইকে মায়ের রেকর্ড করা গলা শোনা গেল। তিনি দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ভক্তরা দড়ির মাধ্যমে মায়ের স্পর্শ পেল। রেকর্ড থেমে যাওয়ামাত্র মা হাত সরিয়ে নিতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করতে চেষ্টা করল সবাই। হরিপদ তাজ্জব। তার দীক্ষা হয়ে গেল? এতদিন ধরে কত কথা শুনেছে সে এই দীক্ষাকে নিয়ে। যিনি দীক্ষা দেন তিনি কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মন্ত্র দেন। এ তো পাইকারি হারে দীক্ষা দেওয়া। যা হোক, এখন সে এদের গুরু-ভাই।

নিয়মিত সন্ধ্যাবেলায় মা ভুবনমোহিনীর আশ্রমে যেতে আরম্ভ করল সে। মোটা চাঁদা দিয়ে সে প্রথম শ্রেণীর শিষ্যদের বসার

জায়গায় প্রবেশের অধিকার পেল। এখন তার আশেপাশে কলকাতার বিখ্যাত ধনীরা। অথচ ম্যাডামকে সে প্রথম তিনদিন দেখতে পেল না। চতুর্থদিনে তিনি এলেন। হরিপদ তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে অবাক। দুটো হাত বুকের ওপরে জোড় করে রেখেছেন। চোখ বন্ধ করে বসে মা ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠে স্তোত্রগান শুনছেন। সন্ধ্যের পর মা বিশেষ বিশেষ দিনে ফুলের সাজে সেজে এমন গান গেয়ে থাকেন। হলঘরে তখন বিশেষ শিষ্যাশিষ্যাদের ভীড়। তাঁদের পোশাক এবং চেহারা দেখলেই বোঝা যায় সমাজের কোন স্তরে বিচরণ করেন।

হরিপদ দাঁড়িয়েছিল পেছনের সারিতে। সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করে মহিলার চোখে পড়তে পারে। অবশ্য উনি যতক্ষণ না চোখ খুলছেন সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ওঁর পেছনে সামনে যে গাদাগাদি ভিড় যে এক পা এগিয়ে কাছে যাওয়ার উপায় নেই। হরিপদ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করে যেতে লাগল মহিলাকে। অফিসে যে সাজগোজ দেখেছিল তা এখন নেই। বেশ ভক্ত ভক্ত দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু ওঁর পেছনের লোকটা কে? মোটাসোটা ভুঁড়িদাস মাথায় টাক লোকটা হাত জোড় অবস্থাতেই মহিলাকে কিছু বললেন যেন। মহিলা সাড়া দিলেন না প্রথম বারে। দ্বিতীয় বারে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন নিঃশব্দে। এবার ভুঁড়িদাস চুপ করে গেল। হরিপদ উশখুশ করে উঠল। আর কেউ কি তার আগে লাইন লাগিয়ে ফেলেছে? সে তার পাশে দাঁড়ানো এক ভক্তকে নিচু গলায় বলল, 'দেখুন, ওই লোকটা মায়ের গানের সময় কথা বলছে।'

ভক্তটি লক্ষ্যবস্তু ঠাওর করে চাপা গলায় বলল, 'লোকটা কি বলছেন মশাই। উনি মায়ের কত বড় সেবক। প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা প্রণামী দেন। টমসন এণ্ড হিউজ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। যা তা বকবেন না মশাই।'

হরিপদ মনে মনে জিভ কাটল। টমসন এণ্ড হিউজ কোম্পানিতে কখনই সে ব্যবসা করতে পারেনি। অনেক বড় বড় কণ্ট্রাক্টর তার আগে ওখানে কায়েম হয়ে অছে। সে খুব নিরীহ গলায় জিজ্ঞাসা করল এবার, 'ওঁকে তো এর আগে এখানে দেখিনি।'

'মাসে একবার আসেন। ডেট ভাগ করা আছে।

'মানে? কিসের ডেট?'

'সেটা আপনাকে বলতে পারব না মশাই। মানে এখানে দাঁড়িয়ে বলা ঠিক নয়।

'ও। তাহলে বলতে হবে না।' হরিপদ আর ভুল করতে চাইল না, মুখ ধেকে তখন কথাটা ফট করে বেরিয়ে গিয়েছিল। 'আপনি দেখছি সব জানেন।'

'জানব না মানে? আমি সাহেবের গাড়ি চালাই। আর ড্রাইভার তো সেক্রেটারির চেয়ে বেশি সাহেবের খবরাখবর জানে। এই তো বৃহস্পতিবার পাথরবাবার আশ্রমে একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি কিন্তু মুখ খুলিনি।' লোকটা বলল।

'পাথরবাবা? উনি কি পাথরবাবার আশ্রমেও যান?'

'আমি জানি না। আমি কিছু বলিনি আপনাকে।' লোকটা মুখ বন্ধ করল। হরিপদ ধাঁধায় পড়ল। সে এতকাল শুনে এসেছে শিষ্যের সংখ্যা লক্ষ হলেও গুরু একজনই। কিন্তু একজন শিষ্যের অনেক গুরু হয়? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল হবেও বা। ঠাকুর নিজেই তো অনেককে গুরু বলে মেনেছেন।

গানের পর অনেক আশীর্বাণী উচ্চারণ করে মা ভুবনেশ্বরী আসন ত্যাগ করে অন্তরালে চলে গেলেন। শিষ্যশিষ্যারা ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের জয়ধ্বনি দিলেন। হরিপদ সেই সুযোগে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। একে ধাক্কা দিয়ে ওকে একটু সরিয়ে সে কোনমতে অনেকটা এগিয়ে গেল। এবার সবাই বেরিয়ে আসছেন। এদের ঠেলে বিপরীত দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোনক্রমে

স্রোত ঠেলে দাঁড়িয়ে রইল সে। এবং তখনই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি হয়ে গেল। তিনি ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগোতে এগোতে হরিপদকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, 'আপনি?' তখন দুপাশ দিয়ে ভক্তরা এগোচ্ছে। হরিপদ হাসল, 'আমি তো প্রতি সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসি।'

'আচ্ছা? বাঃ, কি ভাল!'

'আপনাকে আজ প্রথম দেখলাম।'

'আর বলবেন না, যা ঝামেলা ব্যবসায়। কিছুতেই সময় বের করতে পারি না।' মৃদু শব্দ করে হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'শুধু পাপের বোঝা বাড়াচ্ছি।'

'একথা বলছেন কেন? মায়ের কাছে একবার এলেই সব পাপ ধুয়ে যায়।'

এই সময় সেই টেকো মানুষটি পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'তাহলে ওই কথা থাকল মিসেস গুপ্তা। কাল ক্যালকাটা ক্লাবে কথা বলে নেব।'

খুব বিচক্ষণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ভদ্রমহিলা। টেকো ভুঁড়িদাস দুলতে দুলতে বেরিয়ে গেলেন। হরিপদ বলল, 'গত রবিবারে মায়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। উনি বললেন, সবসময় যে আমার কাছে আসতে হবে তার কোন মানে নেই। মনে মনে ভালবেসে আমাকে ডাকলেই হল।'

মিসেস গুপ্তা চোখ বড় করলেন, 'ওঃ, আপনি কি ভাগ্যবান। যাক, আপনার কথা শুনে তবু মন একটু শান্ত হল। আপনি কি এখানে থাকবেন?'

হরিপদ দ্বিধায় পড়ল। কি বলা উচিত। তার যে আর এখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। সে সত্যি কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'আসলে এখানে এলে তো যেতে ইচ্ছে করে না। তবু যেতে তো হবেই। সংসারী মানুষের এই তো মুস্কিল।'

'না, না। তাহলে থেকে যান আপনি।'

'থাকতে চাইলেই তো আর আশ্রমের নিয়ম ভাঙতে পারি না। এখন আর কারো, মানে বাইরের লোকদের এখানে থাকা নিষেধ। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিচ্ছি।'

মিসেস গুপ্তাকে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। তখনও ভক্তজনেরা সেখানে। গাড়ির ভিড় কমেনি। মিসেস গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে? না থাকলে পার্ক স্ট্রিটের দিকে গেলে নামিয়ে দিতে পারি।'

হরিপদ দূরে পার্ক করা তার বুড়ি গাড়ির দিকে তাকাল। একসঙ্গে মিসেস গুপ্তার গাড়িতে গেলে আরও একটু বেশি সহানুভূতি পাওয়া যাবে। সে চটপট মাথা নাড়ল, 'গাড়িটা গোলমাল করছিল বলে গ্যারেজে রেখে এসেছিলাম। আপনার যদি অসুবিধে না হয়—।'

'বিন্দুমাত্র নয়। আসুন।' নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

হরিপদ আনন্দিত চিত্তে তাঁকে অনুসরণ করল।

বিশাল গাড়ির ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল সে কিন্তু মিসেস গুপ্তা নিষেধ করলেন, 'ওহে, নো। ওখানে কেন? আপনি পেছনে এসে বসুন।'

'ইয়ে, মানে, আপনার অসুবিধে হবে না তো!'

'মাই গড্। অসুবিধে হবে কেন? আসুন।'

গাড়ি চলতে শুরু করলে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আপনি কিন্তু একটু বেশিমাত্রায় ভদ্র।'

'না, না, মানে এই সামনে বসতে যাওয়ার জন্যে বলছেন তো?'

'না। আমার ওখানে ব্যবসা চাইছেন অথচ এখানে কখনই যেচে আলাপ করেননি।' মাথা ঘোরাল হরিপদ। কোন লাইনে কথা

এগোচ্ছে? উত্তর দিতে হয় তাই দিল, 'আলাপ করলে আপনি বিরক্ত হতে পারতেন। ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যেতে পারতাম।'

মাথা নাড়লেন মিসেস গুপ্তা, 'দ্যাটস রাইট।'

গাড়ি পার্ক স্ট্রীটে চলে এল। মিসেস গুপ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? অবশ্য বলতে অসুবিধে থাকলে বলতে হবে না।'

একদম না। খেতে আসছিলাম। আজ বাড়িতে খাবার পাওয়া যাবে না।'

'ওমা! কেন?'

কি মিথ্যে বলবে বুঝতে না পেরে হরিপদ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আর বলবেন না।'

'আজ আমার এখানে তিনজন গেস্ট আসছেন ডিনারে নইলে আপনাকে যেতে বলতাম। ঠিক আছে আর একদিন আমরা কোথাও যেতে পারি।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিন আমি হোস্ট। আপনি ডিনার খেলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।' খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে বলল সে।

'বেশ। আগামীকালই হোক।'

পার্ক স্ট্রীটে নেমে গেল হরিপদ। যতক্ষণ না মিসেস গুপ্তার গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেল ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এল মা ভুবনমোহিনীর আশ্রমে। আশ্রম তখন ফাঁকা। তার বুড়ি গাড়ি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

পরদিন অফিসে ফোন করে মিসেস গুপ্তার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নিয়েছিল সে। কলকাতার অন্য কোন রেস্তোরাঁ না, গ্র্যাণ্ড হোটেলের সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোরাঁতে তিনি আসবেন রাত নটায়। বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরে স্নান সেরে দারুণ সেজে ঠিক সময়ে

হোটেলে চলে এসেছিল হরিপদ। এইরকম অসময়ে ফিরে আসা এবং সাজ ও বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল বলে তোমাদের সংসারের খরচ চালানোর জন্যে অর্ডার আনতে যাচ্ছি। কিন্তু বললে আগুন জ্বলত। আবার এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে ডিনার খেতে যাওয়ার কথা বললে দেখতে হত না। তাকে তাই বলতে হয়েছে পার্টি আছে। কোন বিশদ বিবরণ নয়।

কাঁটায় কাঁটায় নটায় মিসেস গুপ্তা এলেন। দারুণ দামী এবং সুন্দর শাড়ি এবং জামার সঙ্গে গলায় হিরে বসানো হার। হরিপদর মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম। চেয়ারে বসেই মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আমার খুব অবাক লাগছে। এভাবে এত অল্প আলাপে কারো সঙ্গে খেতে আসিনি। হয়তো মা আমাদের এমন করাচ্ছেন।'

'নিশ্চয়ই। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

'কৃতজ্ঞ কেন?'

জবাব দেওয়ার আগেই স্যুট পরা কর্মচারী এসে বো করল। হরিপদ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার জন্যে কি ড্রিঙ্কস বলব?'

'আমি ইণ্ডিয়ান ড্রিঙ্কস নিই না। আপনি স্কচ বলুন। শীভাস'।

হরিপদ ঢোঁক গিলল। সে দেখে রেখেছে এই বস্তুর এক পেগের দাম একশ টাকার কাছাকাছি। তবু বলতে হল। এবং নিজের জন্যে আলাদা কিছু বলা যায় না। দ্বিতীয় পেগ খাওয়ার পর তৃতীয়ের জন্যে অর্ডার দিয়ে ডিনারের মেনু বলতে হল। ইণ্ডিয়া কিং ধরিয়ে মিসেস গুপ্তা বললেন, 'আমার জন্যে মাছ মাংস ডিম বলবেন না।'

'সে কি!,

'কাল থেকে আমি কমপ্লিটলি ভেজিটেরিয়ান।'

'ও।' হরিপদ কি বলবে বুঝতে পারছিল না। নিরামিষাশীরা

মদ খায় বলে তার ধারণা ছিল না। সে খুঁজে খুঁজে নিজের জন্যেও নিরামিষ বলল।

টুকটাক কথাবার্তা, একটার পর একটা সিগারেট এবং ছ'টি স্কচসহ ডিনার খেলেন মিসেস গুপ্তা। খেতে খেতে বললেন, 'মিস্টার গুপ্তা এক্সপায়ার করার পর তো একটুও দম ফেলতে পারি না। আজ অনেকদিন বাদে আরাম করে ডিনার খেলাম।'

'আমার সৌভাগ্য।' শব্দ দুটো বলতে গিয়ে গলা কাঁপল হরিপদর। সে নিজে চার পেগের বেশী নেয়নি। কিন্তু তাতেই গলা ভারী হয়ে গেছে চোখে একটু বেশী মাত্রায় আমেজ।

মিসেস গপ্তা বললেন, 'শুধু কাজ আর কাজ। মায়ের ওখানেই যেতে পারি না রোজ। এদিকে দেখুন ছেলে পড়ে দুন স্কুলে। কি ভীষণ একা লাগে বাড়িতে ফিরলে। তখন ড্রিংক্স আর সিগারেট ছাড়া ঘুম আসে না।'

'আপনি আর একটা ড্রিংক নিন।'

'ওহো। নটি! আমি মাতাল হয়ে যাব। বলুন।'

আর একটা স্কচ আনতে বলল সে। মিসেস গুপ্তা ছয় নম্বর শেষ করে বললেন, 'আপনাকে বন্ধু হিসেবে খুব ভাল লাগছে।'

'আমি গর্বিত।'

'মুস্কিল হল আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চাই।'

খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে সে হাসল, 'মুস্কিল কেন?'

'আপনাকে আমি অর্ডারটা দিতে চাই। কিন্তু দিলে বন্ধুকৃত্য হয়ে যাবে।' মনে মনে জিভ কামড়ালো হরিপদ। সে বলতে চাইল আমি বন্ধুত্ব নয়, অর্ডার চাই। ভদ্রমহিলা কি এই অছিলায় তাকে কাটিয়ে দিতে চান?

মিসেস গুপ্তা মাথা নাড়লেন, 'কিন্তু তবু আপনাকে অর্ডার দেব। আই ওয়ান্ট টু সি ইউ ওয়েল প্লেসড। আপনি মায়ের শিষ্য। বাট হ্যারি, আই অ্যাম লিটল বিট হাই।'

'ভোন্ট ওরি। আমি আছি।'

'প্লিজ।'

সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরল হরিপদ যখন রাস্তায় একটা কুকুরও নেই। মিসেস গুপ্তাকে বাড়িতে পেঁছে দিতে সে হিমসিম খেয়েছে। নিজের গাড়ি ছেড়ে ভদ্রমহিলা তার বুড়ি গাড়িতে উঠেছিলেন। উঠেই বললেন, 'আঃ, এই গাড়ি পাল্টাও হ্যারি। তারপরেই তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ও'র ড্রাইভারকে অনুসরণ করে অভিজাত পাড়ার ফ্লাট বাড়িতে পে'ছৈছিল সে। মিসেস গুপ্তাকে ঘুম থেকে তুলে নিপাট নিয়ে গিয়েছিল ধরে ধরে। মহিলার বয়স হয়েছে কিন্তু এত নরম শরীর ঘরের ভদ্রমহিলার অনেককাল আগে ছিল। মেইড সার্ভেন্ট দরজা খুলতে তার হাতে মিসেস গুপ্তাকে স'পে দিয়ে সে যখন ফিরছে তখন তিনি পেছন থেকে ডাকলেন, 'হ্যারি এক মিনিট।'

গলায় জড়তা নেই। হরিপদ পেছন ফিরল।

'ইউ ডিজার্ভ মাই ফ্রেন্ডশিপ। ছয় পেগ নিয়ে আটক হবার মেয়ে আমি নই। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তুমি কোন বদমায়েসী করার চেষ্টা করোনি। সো ইউ আর মাই ফ্রেন্ড। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান কাম হেয়াব এনি টাইম ওকে।'

মাথা নেড়েছিল হরিপদ। তারপর লিফটের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

পরের দিন বিশাল অর্ডারটা হাতে পেয়েছিল হরিপদ। তার হিসেবে লাভ হয়েছিল এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। সংসারটা এখন স্টেডি এগিয়ে যেতে পারবে।

টমসন অ্যান্ড হিউজ কোম্পানীর কাজ আজ অবধি পায়নি হরিপদ। এক বৃহস্পতিবারে সে পাথরবাবার আশ্রমে হাজির হল।

পাথরবাবা দর্শন দেন পাথরের ওপর বসে। তিনি শুয়ে থাকেন পাথরের ওপর। তাঁর বয়স কত তা কেউ জানে না। কেউ বলে নব্বুই কেউ একশ। পাথরবাবার ভক্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। হরিপদ অনেক চেষ্টার পর একজন সেবককে ম্যানেজ করে পাথরবাবার সামনে পেঁছাতে পারল।

পাথরবাবার ঠোঁটে ঐশ্বরিক হাসি। তিনি বাঁ হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স থেকে ছোট সাদা পাথর তুলে হাতে দিলেন, 'সকাল এবং সন্ধ্যেবেলায় এই পাথর মুঠোয় নিয়ে তিনবার বাবা বাবা বাবা বলবি। বুঝলি?

হরিপর মাথা নাড়ল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

পাথরবাবা বললেন, 'জীবন হল কচুর পাতায় জল। সবসময় টলমল করছে। তবু তার মধ্যে ঈশ্বরের নাম করে নিতে হবে। মরার পর যখন চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করবে কি করেছিস তখন জবাব দিতে পারবি। ঈশ্বরের নাম কি? রাম কৃষ্ণ যীশু মহম্মদ। যার যা ইচ্ছে তাঁকে ডাক। যদি নাম না মনে আসে শুধু বাবা বললেই হবে। বাবা হল জনক। তোর জন্মদাতা। যা। অনেক কথা বললাম।'

হরিপদ ভাগ্যবান। সত্যি পাথরবাবা সচরাচর বেশি কথা বলেন না। যখন মেজাজ ভাল থাকে তখন যে কাছে থাকে তার জীবন ধন্য হয়। সবাই অবশ্য ওই পাথর পায় না। যে পায় তাকে অন্য ভক্তরা বিশেষ চোখে দ্যাখে। ফলে হরিপদর খাতির বেড়ে গেল। সবাই জানতে চায় সে কি ধরনের সাধন ভজন করে যা বাবার পছন্দ হয়েছে। হরিপদ এড়িয়ে যায় বিনয় দেখিয়ে। সে লক্ষ করে মা ভুবমোহিনীর শিষ্যাশিষ্যাদের ধরনের সঙ্গে পাথরবাবার শিষ্যশিষ্যাদের কোথায় যেন অমিল আছে। এঁরা বড় বেশি উগ্র বলে মনে হচ্ছিল তার।

চতুর্থ বৃহস্পতিবার টমসন অ্যান্ড হিউজ কোম্পানির ভুঁড়িদাস

টাকওয়ালা মানুষটি এলেন। সন্ধের মুখে পাথরবাবা একটা বড় মঞ্চে বসে থাকেন চুপচাপ। ভক্তরা তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানেও একদল ভক্ত সমানে ভজন গেয়ে যায়। ভুঁড়িদাস কোনমতে নতজানু হয়ে এগোতে গিয়েও পারলেন না। তাঁর শরীর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। হরিপদ দ্রুত লোকটির পাশে চলে এল। আতরের বাস আসছে শরীর থেকে। সে নিচু গলায় বলল, 'আপনি বাবাকে বলুন না শরীরটাকে ফিট করে দিতে।'

'আরে মশাই, আমার কপালই খারাপ। এখানে এসে মাত্র একদিন বাবার সামনে দাঁড়াতে পেরেছি। প্রাইভেটলি কথা বলব যে তার উপায় নেই।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

ওপাশে এক বৃদ্ধ এই সব কথা শুনছিলেন, আগ বাড়িয়ে বললেন, 'কপাল ভাল ওনার। বাবা কথা বলছেন এবং সেই পাথর পর্যন্ত ওঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।'

ভুঁড়িদাস চোখ কপালে তুললেন, 'তাই নাকি? আপনি কে মশাই?'

'কেউ নই। বাবার শিষ্যই হল আমার পরিচয়।' হরিপদ হাত জোড় করল।

'তা আমার সঙ্গে বাবার একটা দেখাশোনা করিয়ে দিন না!'

হরিপদ হাসল, 'সেটাও তো বাবার ইচ্ছে না হলে হবে না। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি। বাবার দয়া হলে আপনার চেহারা আমার মত হয়ে যাবে।'

'আর বলবেন না, কত ট্রাই করলাম, ডাক্তারের পর ডাক্তার, হেলথ ক্লিনিক, পাউডার খেয়ে দিন কাটানো, সব ফালতু হয়ে গেল। শরীর ফিট না থাকলে টাকা রোজগার করে সুখ নেই মশাই। ফুর্তি করতে পারি না, জীবন নষ্ট হয়ে গেল।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি চেষ্টা করছি।'

'আপনার নামটা?'

হরিপদ নিজের নাম বলল। কথাবার্তায় আশেপাশের মানুষরা বিরক্ত হচ্ছিল। ভুঁড়িদাস তাকে ইশারা করে বাইরে বের করে নিয়ে এলেন, 'আমার নাম জগৎ আগরওয়াল। চারপুরুষ কলকাতায় আছি তাই বাঙালিই বলতে পারেন। টমসন অ্যান্ড হিউস কোম্পানিটা আমার। নাম শুনেছেন?'

নিশ্চয়ই। কত বড় ব্যবসা আপনার!'

'আর বড় ব্যবসা। শরীর নিচু করতে পারি না। ওয়াইফ পর্যন্ত অ্যানহ্যাপি।'

হরিপদ কিন্তু কিন্তু করল। তারপর সটান বলে ফেলল, 'আপনার রাইভ্যাল কোম্পানি জ্যাকসন অ্যান্ড জ্যাকসনে গিয়ে অনেক কথা শুনেছি।'

'জ্যাকসন? ওখানে যান কেন আপনি?'

'আজ্ঞে একটু ব্যবসার ব্যাপারে।'

'ব্যবসা? কি ব্যবসা করেন আপনি?'

'খুবই সামান্য ব্যাপার।'

'সেটাই তো শুনতে চাইছি। আমার রাইভ্যালের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক আপনার?'

'অতএব হরিপদ তার ব্যবসার কথা বলল।' জগৎ আগরওয়াল সেটা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর জিভে চুক চুক শব্দ করলেন, 'ও কি ব্যবসা দেবে? কি ক্ষমতা আছে ওদের। আপনি কালই আমার অফিসে চলে আসুন। ঠিক সকাল দশটা দশ মিনিটে।'

মোটা টাকার অর্ডার পেল হরিপদ। জগৎ আগরওয়াল কিছুটা অ্যাডভান্স দিয়ে জানিয়ে দিলেন যদি সে পাথরবাবার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করিয়ে দেয় তাহলে কাজটা করে দিলেও বাকি পেমেন্ট আটকে রাখবেন। দেখা হবার পর বাবা যদি প্রসন্ন না হন তাহলে হরিপদর কোন দায় থাকছে না।

যে শিষ্যকে ম্যানেজ করে হরিপদ পাথরবাবার দর্শন পেয়েছিল

একাকী সেই শিষ্যকে তো আরও সহজে ম্যানেজ করতে পারতেন জগৎ আগরওয়াল। হরিপদ ভেবে পাচ্ছিল না ও'র মত বড়লোক কেন সরাসরি পাথরবাবার সামনে যেতে পারছেন না। সে সাতদিন সময় চাইল। সাতদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করলে তবে কাজ হাতে নেবে।

এমন বিপদে সে জীবনে পড়েনি। পাথর পকেটে থাকায় সে স্বচ্ছন্দে পাথরবাবার আশ্রমের অনেকটা ভেতরে চলে যেতে পারে। কিন্তু গিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। সেই পরিচিত শিষ্যটি জানাল জগৎ আগরওয়ালের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে সবাই। কিন্তু বাবা দূর থেকে তাঁকে দেখেই হাত নেড়ে চলে যেতে বলেছেন। এ বাবদ তিনি কম খরচ করেননি। অতএব ও'র ব্যাপারে কিছু করা যাবে না। প্রমাদ গুনল হরিপদ। কিছু করা না গেলে অর্ডারটা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে! একটা উপায় বের করতে সে মরিয়া হল।

লক্ষ ভক্ত যার তিনি তো সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবেন। পঞ্চম দিনের সকালে পাথর দেখিয়ে সে যখন বাবার অন্দরমহলে তখন কমল যোশীর সঙ্গে আলাপ হল। কমলও পাথর পেয়েছেন। পাটনায় তাঁর বিশাল ব্যবসা। গুরুভাই হিসেবে তিনি মোটেই মন্দ নন। কমলের দাদা বিমল যোশী কলকাতার এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্তা। কিন্তু তিনি পাথরবাবাকে পছন্দ করেন না। তাঁর গুরু শ্রীশ্রী বিশ্বামিত্র স্বামী। হরিদ্বারে তাঁর বিরাট আশ্রম। প্রতিবছর গুরু পূর্ণিমার সময় বিমল গুরুদেবকে দর্শন করতে যান। কমল পাথরবাবা ছাড়া কিছু জানেন না। পাথর-বাবাও তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। হরিপদ কমলকে ধরল একবার পাথরবাবার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে। তিনি রাজি হলেন। কিছুক্ষণ বাদে যখন তাঁর ডাক এল তখন হরিপদ তাঁকে অনুসরণ করল। পাথরবাবা চোখ বন্ধ করে বসে বললেন, 'কমল। বাবাকে ডাক। তোর ডাকা কম হচ্ছে। অত কম ডাকলে কি হয় রে পাগল?'

কমল যোশী প্রায় নতজানু হয়ে বললেন, 'না বাবা, আর ভুল হবে না, আর ভুল হবে না।'

পাথরবাবা হরিপদর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে?'

হরিপদ হাত জোড় করল, 'বাবা আমি আপনার শিষ্য, আপনি আমাকে পাথর দিয়েছেন। সকাল দুপুর রাত সময় পেলেই আমি আপনাকে ডাকি।'

'আচ্ছা! আমাকে কেন? বাবাকে ডাকবি। যে বাবা পৃথিবীকে জন্ম দিয়েছেন। তাঁকেই প্রাণ খুলে ডাকবি। আর ওই পাথরটা দিনে দুবার কপালে ঠুকবি; ঠুকে বলবি আমার সমস্ত অহঙ্কার দূর হয়ে যাক। আর কিছু বলবি?'

'বাবা আপনার একজন শিষ্য সারা দিনরাত শুধু বাবাকেই ডেকে যাচ্ছেন। তাঁর ভীষণ ইচ্ছে একবার আপনার পায়ে মাথা রাখেন।'

'কি করে সে?'

'টমসন'অ্যান্ড হিউজ কোম্পানির মালিক।'

'ব্যবসা করে? ঠিক আছে তাকে নিয়ে আয়।'

হরিপদ জিতে গেল। জগৎ আগরওয়াল খবর পেয়ে দারুণ উল্লসিত। তখনই মিষ্টি খাওয়ালেন। নিজে খেতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিলেন, 'না মশাই, প্রতিজ্ঞা করেছি মিষ্টি খাবো না। বাবা শুনলে নিশ্চয়ই রাগ করবেন।'

হরিপদ আগেই বাবার প্রহরীদের জানিয়ে রেখেছিল, জগৎ আগরওয়াল তার পেছন পেছন বুক ফুলিয়ে দরজাগুলো পেরিয়ে শেষপর্যন্ত বাবার সামনে পেঁছে দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করলেন। বাবা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানা। মাটিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।'

জগৎ আগরওয়াল মুখ ঘুরিয়ে হরিপদর দিকে তাকাতেই সে ইশারা করল আদেশ পালন করার জন্যে। জগৎ কোনমতে হাঁটু

মুড়ে বসলেন। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে বেশ চেষ্টার পর উপুড় হলেন। কিন্তু তাঁর মাথা কাঁধ এবং পা দুটো দুলতে লাগল। বিশাল ভুঁড়ি প্রতিবন্ধক হওয়ায় দুই অংশ মাটিকে স্পর্শ করছিল না। হরিপদর হাসি পেয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে গম্ভীর রাখল সে। দুটো হাত সামনে ছড়িয়ে জগৎ আগরওয়াল আর্তনাদ করলেন, 'বাবা বাঁচান আমাকে'।

পাথরবাবা জিজ্ঞাসা করলেন 'কেন, কি হয়েছে?'

সেই একই অবস্থায় জগৎ আগরওয়াল বললেন, 'এই ভুঁড়ি, আমার জীবন বরবাদ করল।'

'ওটাকে কমাতে চাস?'

'হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ। আপনি কমিয়ে দিন বাবা। আমি আপনার ত্রিবেণীর আশ্রমের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব। আপনি যা হুকুম দেবেন তাই করব।'

'আমি কমাবার কে? যিনি পারেন তাঁকে ডাক। ওইভাবে, যেভাবে এখন রয়েছিস। রোজ সকাল-বিকেলে পাঁচশো পাঁচশো হাজারবার ওইভাবে দুলে দুলে বাবাকে ডেকে যাবি। তিনি যদি সদয় হন তাহলে তোর বাসনা পূর্ণ হবে। ওরে কে আছিস ওকে ধরে তোল। আমি এখন বিশ্রাম করব।'

সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ছুটে এসে ধরাধরি করে জগৎ আগরওয়ালকে তুলল। তাঁর দামী পাঞ্জাবির ওপর ময়লার ছাপ পড়ে গেছে ইতি-মধ্যে। বাইরে বেরিয়ে এসে জগৎ আগরওয়াল নিজের ভুঁড়িতে হাত রেখে বললেন, 'বাবার ক্ষমতা আছে, বুঝলেন। একবারেই মনে হচ্ছে কিছুটা কমে গেছে। তবে খুব ব্যথা লাগে। উঃ।'

হরিপদর অফিসের চেহারা পাল্টে গেল। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল। একটা ইন্টিরিয়ার ডেকরেটরের সাহায্য নিয়ে সে চমৎকার সাজাল অফিস। এখন সে বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। কিন্তু ওই দুটো বড় অর্ডার তার বাঁধা হয়ে যাওয়াতে বাড়িতে

আগের দ্বিগুণ টাকা দিতে পারছে। সে যে প্রচুর অর্থ রোজগার করছে এবং তা করতে হলে সময় দিতে হয় এমন একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে বাড়িতে। এটা বেশ স্বস্তিকর।

জগৎ আগরওয়াল এখন তাকে ছাড়তে চান না। তাঁর ভুঁড়ি কমছে। মিসেস গুপ্তাকে প্রতি সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যায় ডিনার খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়। মোটা খরচ। কিন্তু যা লাভ হচ্ছে তার তুলনায় কিছু নয়। মিসেস গুপ্তার একটা বিশেষ গুণ আছে। তিনি ডিনার টেবিলে নানান গল্প করেন। মদ্যপানে নিরস্ত হন না কিন্তু কখনই সম্পর্কের সীমা লঙ্ঘন করেন না। ডিনার খেয়েই সোজা নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে যান গুডনাইট বলে।

কিন্তু দুই গুরুর দুই শিষ্যের মাধ্যমে যে ব্যবসা আছে তার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। ব্যবসা আরও বাড়াতে হবে। যেসব মানুষের কাছে হরিপদ সরাসরি এই জীবনে পৌঁছাতে পারত না গুরুর শিষ্য হবার সুযোগে তা সম্ভব হচ্ছিল। সে একটার পর একটা গুরুর শিষ্য হতে লাগল। তার ডায়েরিতে এই মুহূর্তে কলকাতায় জনপ্রিয় গুরু বা গুরুমা আছেন আটাশ জন। এঁদের কাছে নিয়মিত যে সব ব্যবসায়ী দীক্ষাসূত্রে যাতায়াত করেন তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনশজনের হাতে বড় এবং মাঝারি ব্যবসা আছে। হরিপদর আলাপ হয়েছে আটাশ জনের সঙ্গে। তার মধ্যে ব্যবসা পেয়েছে ছয় জনের কাছ থেকে। বাকিদের কাছে সে ইচ্ছে করলেই পৌঁছাতে পারে কিন্তু মোটা ব্যবসার জন্যে সে এড়িয়ে যাচ্ছে। এখন ছোটখাটো অর্ডার নিয়ে হরিপদ মাথা ঘামাচ্ছে না। তার অফিসে একটা বিরাট অ্যালবাম রেখেছে। অ্যালবামের পাতায় পাতায় গুরুদেব অথবা গুরুমার ছবি, ঠিকানা। তার নিচে যে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তার বিশদ বিবরণ। এই মুহূর্তে সে আটাশ জন গুরুর শিষ্য। প্রত্যেকের উপদেশ এবং বাণী সংকলন করে সে একটা বিশেষ বাণী তৈরি করেছে। সেটা তার

মুখস্থ। যে কোন গুরুর শিষ্য তা শুনলেই ভাববে হরিপদ তার গুরুর উপদেশের কথাই বলছে। যা হোক, হরিপদ এখন একটি মারুতি ডিলাক্সে চলাফেরা করে। যদিও পুরানো গাড়িটা সে রেখে দিয়েছে, ওটা বাড়ির মেয়েরা ব্যবহার করে।

হঠাৎ খবরের কাগজে চোখ আটকাল হরিপদর। হরিদ্বারে গুরুপূর্ণিমার মেলা হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল কমল যোশীর কথা। ভদ্রলোক এখন পাটনায়। এবং ওঁর ভাই-এর সঙ্গে সে যোগাযোগ করার চেষ্টাও করেনি। খবর নিয়ে জেনেছে বিমল যোশী অত্যন্ত কড়া ধাতের মানুষ। কোন রকম তরল ব্যাপার পছন্দ করেন না।

এই বিমল যোশী গুরুপূর্ণিমায় হরিদ্বারে যাবেন। কলকাতায় যে মানুষ খুব কড়া হরিদ্বারে তার স্বভাব পাল্টাতেও তো পারে। ভদ্রলোককে ওখানে গিয়ে ধরতে হবে। কি যেন ওঁর গুরুর নাম? হরিপদ ফাঁপরে পড়ল। কিছুতেই তার নামটা মনে পড়ছে না। সে নিজেকে গালাগাল দিতে লাগল। কেন যে সেদিন নামটা নোট করে রাখেনি। হাতে যা সময় আছে তাতে পাটনায় চিঠি লিখে নামটা কমল যোশীর কাছে জানাতে গেলে গুরুপূর্ণিমা চলে যাবে।

হরিপদ ঠিক করল হরিদ্বার গিয়ে খোঁজ করবে। একটা ক্লু সে পেয়েছে। বিমল যোশীর গুরুদেবের নামের পাশে শব্দটি রয়েছে। ডায়েরি লেখা তার অভ্যেস। সেই পুরনো ডায়েরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে একটা পাতার কোণে স্বামী শব্দটাকে চারবার লেখা দেখল। সে নিজেই লিখেছিল। এবং তখনই তার মনে পড়েছিল বিমল যোশীর দাদার গুরুদেবের নামের সঙ্গে স্বামী শব্দটি জড়িয়ে ছিল। সেদিনের কথা সে সব লিখেছে কিন্তু কেন যে ভদ্রলোকের গুরুদেবের নামটা লেখেনি তা বুঝতে পারছে না। তাই হরিদ্বারে গিয়ে খোঁজ করতে হবে স্বামী নামক গুরুদেবের আশ্রম কোথায়?

দুন এক্সপ্রেসের ফার্স্টক্লাসে সে কলকাতা থেকে রওনা হল।

মেয়ে আসতে চেয়েছিল সঙ্গে কিন্তু সে রাজি হয়নি। নিজের মেরু-দণ্ড বাঁকানো চেহারা মেয়ে দেখুক তা যেমন কোন বাবা চায় না সেও চায়নি। হ্যারল্ড রবিন্সের বেটসি পড়তে পড়তে সে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। এই সব বই পড়লে এখনও মনে হয় তার বয়স হয়নি। সে গল্পের নায়কের মতো কাজকর্ম করে যেতে পারে। যদি সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করত এবং মেয়ে না হত তাহলে এখন যে কোন মেয়ের মন জয় করা তার পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল? চিন্তাটা মাথায় আসতেই সে নিজেকে সতর্ক করল। যে আটাশ জন গুরুর শিষ্য তার পক্ষে এমন ভাবনা ভাবা মোটেই উচিত নয়।

কামরায় এক বৃদ্ধ ছিলেন। রিটায়ার্ড রেলকর্মী। তিনিও গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে হরিদ্বারে যাচ্ছেন। আলাপ হবার পর হরিপদ জানল ভদ্রলোক প্রতি বছর দুবার হরিদ্বারে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট আশ্রম এবং মন্দির তাঁর নখদর্পণে। হরিপদ তাঁকেই জিজ্ঞাসা করল স্বামী নামের কোন গুরুর কথা তিনি শুনেছেন কিনা! বৃদ্ধ বললেন, 'হরিদ্বারে দুজন স্বামী আছেন। একজন আশ্রম করেছেন হরিদ্বারের কাছে কনখলে। তিনি খুব নামী নন। অন্যজন আছেন কিছু দূরে হৃষিকেশে। সেখানে তাঁর বিশাল আশ্রম। তবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিদেশীই বেশি। তাঁরা সেই আশ্রমে বসবাস করেন। এই বিশ্বামিত্র স্বামীর নাম ভারতবর্ষের বাইরেও বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি অবশ্য তাঁকে কোনদিন দেখিনি।'

টিকিট কাটা ছিল হরিদ্বার পর্যন্ত। সেখানে নেমেই হৃষিকেশের ট্রেন আধঘন্টার মধ্যে ধরা যেত। কিন্তু ধরল না হরিপদ। সহযাত্রীর কাছে শুনেছে কনখল হরিদ্বারের গায়েই। ওখানেও একবার যাওয়া দরকার। নামটা যদি গোলমাল হয়, কোন রিস্ক নেবে না সে।

যদিও গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে এখন সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে ভক্তরা আসছেন তবু রিক্সা নিয়ে হরিদ্বারের পথে যেতে ভাল লাগল তার।

ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়িয়ে যেতেই মন আরও নির্মল হল। সে রিকশাওয়ালাকে বলেছিল কোন ভাল হোটেলে নিয়ে যেতে, ধর্মশালা-টালা চলবে না। রিকশাওয়ালা তাকে নতুন তৈরি একটা দামী হোটেলে নিয়ে এল। হোটেলওয়ালা বললেন, 'হরিদ্বারের নিয়ম মেনে আপনি এখানে নিরামিষ খেতে পারেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে আপনি যদি কিছু করেন তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই। আমরা টের না পেলেই হল।'

'ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি মাছমাংস খেতে কি এখানে এসেছি?'

'আমি তো কিছু বলিনি স্যার। ওই যে বারো নম্বর ঘরে জাস্টিস বরুণ সেন আছেন, সন্ধের পর হর কি পেয়ারী থেকে ঘুরে এসে নিয়ম করে চার পেগ হুইস্কি খান দরজা বন্ধ করে, আমার কিছু বলারই নেই।'

'হরিদ্বারে মদ্যপান নিষিদ্ধ না?'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। ঘরের দরজা বন্ধ করে স্বামী স্ত্রী এই হরিদ্বারে তাদের ইচ্ছেমত যা খুশি করতে পারে, আমার তাতে কি এসে যায়!'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি শাক্ত, দরজা বন্ধ করেই সাধনা করব।'

সকালে একটু বিশ্রাম নিয়ে হরিপদ হরিদ্বার সন্দর্শনে বের হল। ঈশ্বরের আবাস এবং মানুষের আর্তি দেখে দেখে সে ক্রমশ মোহিত হয়ে পড়ছিল। তার মনে হচ্ছিল এতকাল অনর্থক টাকা রোজগারের ধান্দায় মনের শান্তি নষ্ট করেছে। এসব জায়গায় তার নিয়মিত আসা উচিত ছিল। এই কথকতা, কীর্তন, মন্দিরের ঘণ্টা এবং গঙ্গার জল তার হৃদয়ে প্রশান্তি আনছিল।

সন্ধ্যায় হর কি পেয়ারীতে চুপচাপ বসে প্রদীপ ভাসানো দেখল। তার মনে হল অনর্থক সে বিমল যোশীর খোঁজ করছে। আর একটা

মিথ্যে দিয়ে ব্যবসা আদায় করা। কি দরকার! যা রোজগার করেছে তা দিয়ে মেয়ে বউ বেশ বেঁচে বর্তে থাকবে। সে মন দিয়ে একজন কথকের মুখে কথকতা শুনল। তারপর রাত হতে হোটেলে ফিরে এল। ম্যানেজারকে খাবার ঘরে পাঠিয়ে দেবার কথা বলে সে স্যুটকেশ থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে খাটের ওপর বাবু হয়ে বসল। এখনও চোখের পাতায় গঙ্গায় ভেসে যাওয়া প্রদীপের ছবি যেন ভাসছে। মানুষ যদি তার জীবনের প্রতিটি দিন ওই প্রদীপের মত এমনি করে ঈশ্বরের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিতে পারত!

সবে আধপেগ খেয়েছে হরিপদ এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। বিরক্তিকর। খেতে খেতে ওঠা ধাতে সয় না। এরই মধ্যে খাবার পাঠিয়ে দিল লোকটা? সে টেলিফোন তুলে ম্যানেজারকে চাইল। কিন্তু ভদ্রলোক বললেন তিনি এখনও খাবার পাঠাননি। তাহলে এ লোকটা কে? অগত্যা বিছানা থেকে নেমে দরজা ঈষৎ খুলে সে দেখল একজন খুব সম্ভ্রান্ত চেহারার প্রৌঢ় বাইরে দাঁড়িয়ে। ওই ফাঁক দিয়েই তিনি বললেন, 'এক্সকিউজ মি, মানে আমাকে মাপ করবেন। একটু কথা বলতে এলাম।'

'আমি ব্যস্ত!'

'ওহো। সাধনার সময়ে এসে পড়েছি বুঝি?'

'মানে?'

'ম্যানেজার অবশ্য বলেছেন আপনি শাক্ত, দরজা বন্ধ করে সাধনা করেন।'

হরিপদ হতবাক। নিজেকে একটু সামলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি?'

'আমি সতীকান্ত চৌধুরী। বিচারপতির চাকরি করি।'

হরিপদ নাড়া খেল। সে তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লা দুটো আর একটু প্রশস্ত করে বলল, 'আসুন আসুন। কি সৌভাগ্য।'

সতীকান্ত ঢুকলেন, হেঁ হেঁ, এ কি বলছেন। আমরা পাপী

তাপী লোক শুনে কৌতূহল হল তাই এলাম। এখানে চট করে কেউ নিজেকে শাক্ত বলে না তো।'

দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোককে বসাল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অকারণে সন্ধে কাটাব না।'

'অকারণে? মানে?'

'কারণ!' হুইস্কির বোতলটা তুলল হরিপদ।

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'জীবনে সব ছেড়েছিলাম, ওইটে বাদে। তবে বেশি দেবেন না কিন্তু।' গ্লাস ভরে দিল হরিপদ। তারপর আবার বিছানার মাঝখানে বাবু হয়ে বসল।

সতীকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন গ্লাসে একবার চুমুক দিয়ে, 'শাক্ত মানে, আপনি মা কালীর সাধনা করেন? কি রকম?'

হাসি চাপল হরিপদ। তারপর বলল, 'যে কোন সাধনাই হল এক ধরনের ভালবাসা। প্রেম। তিনি প্রেম দিয়েছেন। অথচ আমরা জানি না প্রেম কি! তিনি আমাদের প্রেম করেন। আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। অন্ধতা আমাদেরই। কিন্তু আমি চেষ্টা করি। তাঁকে মাতৃরূপে ভেবে ভালবেসে যাই।'

'বাঃ। চমৎকার কথা বলেছেন। আচ্ছা, ব্যক্তিগত জীবনে—!'

'এখানে আর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলবেন না। ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মনকে উদার করুন। আর একটু কারণ নেবেন?'

সতীকান্ত কিছুক্ষণ অনিমেষে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হঠাৎ দুটো হাত যুক্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রবঞ্চনা করবেন না, আপনার সত্যিকারের পরিচয় বলুন?'

'কেন? এ কথা মনে হচ্ছে কেন?' হরিপদর বেশ মজা লাগল। তরল পদার্থের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছিল। খুব হালক্রা লাগছিল তার।

'এসব কথা সাধারণ মানুষের মুখে আসবে না। শুনেছিলাম

আপনি শাক্ত। কিন্তু শাক্তরা যে সাধনার কথা বলেন তা আপনার মুখে শুনছি না। তাই—।'

'রামপ্রসাদের নাম শুনেছেন? কত বড় সাধক? মা কালীর সাধনা করতেন। ওঁর মত শাক্ত কোন সাধনার কথা বলতেন? নরম, প্রেমের কথা, তাই না?' কথাগুলো ঠিক সময়ে মাথায় আসায় খুব খুশি হল হরিপদ। তার মনে হচ্ছিল সে নিজে কথা বলছে না, কেউ তার মুখ দিয়ে বলাচ্ছে।

'ঠিক, ঠিক কথা। তা আপনি—'

শেষ করতে দিল না হরিপদ, 'আমি এখানে এসেছি স্বপ্নাদেশে। স্বপ্নে দেখেছি একজন জাগ্রত মহাপুরুষ স্বামী নামে এখানে আশ্রম করে আছেন। তাঁকে দর্শন করব। দুটো মনের কথা বলব!'

'বুঝেছি, বুঝেছি। আপনি হৃষিকেশের বিশ্বামিত্র স্বামীর কথা বলছেন? তিনি তো জগৎবিখ্যাত। সারা পৃথিবী থেকে শিষ্যাশিষ্যারা আসছে। আমেরিকান বেশি। এই তো গতকালই তাঁকে দর্শন করে এলাম আমি।'

'আপনি তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন?'

'হেঁ, হেঁ, তা আপনার শুভকামনায় অনেকেই আমাকে পছন্দ করে। আপনি যেতে চান? বেশ তো, আমার সঙ্গে চলুন, আমি একেবারে স্বামীজির সামনে পেঁৗছে দেব আপনাকে। এমনিতে ঢুকতে অনেক ঝামেলা। বিখ্যাত মানুষদের ক্ষেত্রে যা হয়। অবশ্য আপনার কথা আলাদা।'

হরিপদ বলল, 'ঠিক আছে। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়া যাক। আজ তাহলে খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নিই?'

সতীকান্ত উঠলেন, 'বড় ভাল লাগল। আপনাদের সান্নিধ্যে এলে জীবন ধন্য হয়।

পরদিন সকালে সতীকান্তর ব্যবস্থা করা গাড়িতে চেপে সোজা হৃষিকেশ। আজ দিনের আলোয় মুখ বন্ধ করে বসেছিল হরিপদ।

প্রশ্নের উত্তরে শুধু হাঁ হাঁ করে যাচ্ছিল। কাল রাত্রে নেশার ঘোরে যেসব বাক্য বলেছে তা সাদা চোখে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং বেশ নার্ভাস লাগছিল ওই জন্যে।

লছমনঝোলা যাওয়ার আগে বাঁ দিকের চড়াই-এর পথ বেয়ে কিছু দূরে চলে এসে বাঁ দিকের পাহাড়ে ঢুকল গাড়ি। এবং তারপরেই আশ্রমের গেট দেখা গেল। ইংরেজিতে লেখা আছে, 'লাভ মি অ্যান্ড ইউ উইল গেট পিস।' গেটের সামনে গোটা পঞ্চাশেক দর্শনপ্রার্থী। তাদের বলা হচ্ছে বিকেল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। স্বামীজি তখনই তাদের দর্শন দেবেন। সতীকান্তর পরিচয় পেয়ে তাদের গাড়ি ছাড়পত্র পেল। কিছুদূরে আসার পর গাড়ি ছেড়ে দিতে হল। একমাত্র স্বামীজি এবং তাঁর প্রধান শিষ্যশিষ্যা ছাড়া কারো গাড়ি এই সীমার ওপারে যাবে না। হরিপদ গাড়ি থেকে নেমে মুগ্ধ হল। কি নির্জন সুন্দর আশ্রম। আসার পথে সতীকান্ত জানিয়েছেন অন্তত আধ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে এই আশ্রম গড়ে উঠেছে। ভক্তশিষ্যাদের জন্যে আবাসন এবং অন্যান্য কাজকর্মের জন্যে বেশ আধুনিক কুটিরের ব্যবস্থা করা আছে। তার চোখে পড়ল বিদেশী বিদেশিনীরা যুগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ রীতিমত ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। সতীকান্ত বললেন, 'এই সব মানুষদের স্বামীজি আজ্ঞা দিয়েছেন নিজেদের নির্মল করে নিতে। সেই অবস্থায় পৌঁছে গেলে তিনি ওদের ঈশ্বরের সন্ধান দেবেন। দেহের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। আগে দেহের ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে হবে কামের অন্ধকার দূর করে।' দেখেশুনে হরিপদর মনে হল তার বেশ বয়স বেড়ে গিয়েছে। এরকম আশ্রমে বছর পনের আগে এলেও একটা কাজ হত।

বিশ্বামিত্র স্বামীর অবস্থান যেখানে, সেখানে বিশাল চাতালের ওপর কয়েকশ ভক্ত বসে আছেন। তাঁদের ভঙ্গি যোগসাধনার। আসন করে আছে সবাই। নির্বাক। সতীকান্তর ইশারায় হরিপদ

তাদের সবার পেছনে বসে পড়ল। সে দেখল এই সব মৌনী ভক্তদের অধিকাংশই বিদেশী। এবং তাদের মধ্যে বিদেশিনীর সংখ্যাই বেশি। দূরে মঞ্চের ওপর এক বৃদ্ধ বসে আছেন। সোনার মত তাঁর গায়ের রঙ। তিনিই যে বিশ্বামিত্র স্বামী এতে সন্দেহ নেই। তাঁর দুই পাশে দুজন রমণী বসে আছেন যোগাসনে। একজনের একটু বয়স হয়েছে এবং তাঁকে দেখলে বোঝা যায় তিনি ভারতীয়। অন্যজন বিদেশিনী এবং সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। হঠাৎ দুটো হাত দুই দিকে ডানার মত বাড়িয়ে শিষ্যাদের কাঁধ স্পর্শ করতেই তাঁরা চোখ খুলে তাঁকে নমস্কার করলেন। প্রৌঢ়া শিষ্যা ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন, 'স্বামীজি অনুমতি দিয়েছেন। এবার আপনারা আরাম করে বসুন।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই নড়ে চড়ে স্বাভাবিক ভাবে বসল। এবং সমস্বরে যে চিৎকার উঠল তার অর্থ যে স্বামীজির জয়গান গাওয়া তা বুঝতে খানিক সময় লাগল হরিপদর। স্বামীজি হাত তুলতেই সবাই চুপচাপ।

স্বামীজি বললেন, 'তোমাদের মনে কি আনন্দ এসেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে উত্তর হল, হ্যাঁ।'

'এই আনন্দ জিইয়ে রাখো। যা করবে আনন্দের সঙ্গে করো। আমার কাছে এলেই তোমাদের যত দুঃখ দূরে সরিয়ে রাখবে। দুঃখ হল কুকুর বেড়ালের ছানার মত। যতদিন কুকুর ছানাকে দুধ খাওয়ায় তদ্দিন চিনতে পারে। একবার ছানাকে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নাও, বছর খানেক আলাদা রাখো কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। কে মা কে ছেলে। তেমনি দুঃখকে সরিয়ে রাখো, রাখো কিছুদিনের জন্যে দেখবে আর দুঃখ হচ্ছে না। যা কান্না জম্মাবার সময় কেঁদে নিও। তারপর আনন্দ। যারা আমার কাছে আসে তারা কখনও দুঃখে থাকে না। কি, দুঃখে আছো?'

সমস্বরে জবাব ভেসে গেল, 'না।'

বিশ্বামিত্র স্বামী বললেন, এই আনন্দ পেতে হলে মন চিন্তামুক্ত করতে হবে। সেটা তোমরা এখানে এসে করতে পারো আবার এই আশ্রমের যে-কোন গাছের নিচে বসেও করতে পারো। আমাকে যারা ঈর্ষা করে তারা রটাচ্ছে আমি নাকি এখানে নারীপুরুষের অবাধ মিলনকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। মিলন মানেই অবাধ! যে মিলনে বাধা থাকে তা কখনও সার্থক? পুরুষ নারীর শরীর নিয়ে খেলায় মাতে বলেই তো শিশু মায়ের বুকে অমৃতের ভাণ্ডার খুঁজে পায়। মূর্খ, মূর্খ ওরা। আজ আমার শরীর ঠিক নেই। আজ এই পর্যন্ত!' বলেই স্বামীজি তাঁর দুটো হাত শূন্যে মেলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দুই শিষ্যা উঠে পড়ে সেদুটো ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে টেনে ওঠালেন। স্বামীজি এবার তাঁদের দুই কাঁধ অবলম্বন করে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে নেমে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁদের যাওয়ার পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে ভক্ত সেবকরা।

সতীকান্ত বললেন, 'এ বেলা এই পর্যন্ত। ও বেলায় নতুন ভক্তদের দেখা দেবেন স্বামীজি। সবাইকে প্রশ্ন কাগজে লিখে দিতে হবে। তা থেকে নির্বাচন করে ওঁকে দেওয়া হবে। উনি তার উত্তর দেবেন।'

হরিপদ বলল, 'হুম্। কিন্তু অতৃপ্ত থেকে গেল। আচ্ছা, এখানে বিমল যোশী নামে স্বামীজির কোন শিষ্য এসেছেন?'

'কে তিনি? মানে কি করেন?'

'কলকাতায় থাকেন। বড় ব্যবসায়ী।'

'ওই খবর নিতে হলে অফিসে যেতে হবে। আপনি এক কাজ করুন। একটু ঘুরে টুরে আশ্রমটা দেখুন। দেখে ওই গাড়ির কাছে চলে যান। আমি অফিস থেকে না হয় ঘুরে আসছি।' সতীকান্ত চলে গেলেন।

হরিপদ নিশ্চিন্তে হাঁটছিল। গাছগাছালি, পাহাড়ি অসমতল পথ। প্রায়ই যুগলমূর্তি দেখা যাচ্ছে। প্রকাশ্যেই তারা আদর

করছে নিজেদের। দুজন আবার দুদিকে মুখ করে পিঠে পিঠ দিয়ে বসে ধ্যান করছে। বেশ মজা লাগছিল তার। হঠাৎ একটি ফুলের ঝোপের পাশ থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। মহিলা বিদেশিনী। বয়স চল্লিশের ওপরেই। মুখে ছাপ পড়েছে। কিন্তু এখনও চটক আছে কিছু। তিনি হেসে বললেন, ইংরেজিতেই 'নতুন এসেছেন?'

'হ্যাঁ আজই।'

'আপনি কি দীক্ষা নিয়ে এখানেই থাকবেন কিছুদিন?'

কি মনে হল, হরিপদ বলল, 'হ্যাঁ, স্বামীজি তাই নির্দেশ দিয়েছেন।'

মহিলার মুখে হাসি ফুটল, 'আমি বারবারা। আপনি কি একা?'

'হ্যাঁ। আমি একাই এসেছি।'

'আমার সঙ্গী ছিলেন ডেনমার্কের এক ভদ্রলোক। দু মাস আমরা একসঙ্গে কাটিয়েছি। কিন্তু একটা ফরাসী অল্পবয়সী মেয়ে এসে তাকে কব্জা করেছে। কি মুশকিলেই না পড়েছি।' নিঃশ্বাস ফেললেন বারবারা।

'সেকি? আপনি নালিশ করেননি কেন?'

'ওমা, কার কাছে নালিশ করব? স্বামীজি বলেছেন যদি আমরা পরস্পরকে ধরে রাখতে না পারি তাহলে আমাদের কোথাও কোন গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। জোর করে সম্পর্ক টানা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়।'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।'

'কিন্তু একা একা যে কি খারাপ লাগে। যেদিকে তাকাই কেউ কারো সঙ্গে আছে। আপনার খারাপ লাগছে না?'

'নিশ্চয়ই। মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'আর মন খারাপ করতে হবে না। আমি তো এখানে বেশ

কিছুদিন আছি. সব শিখিয়ে দেব আপনাকে।' বারবারা হাত বাড়াল, 'আসুন আমরা জোট বাঁধি। দেখবেন আমরা আনন্দিত হব।'

হরিপদ রোমাঞ্চিত। হোক বয়স কিন্তু বিদেশিনী তো। কিন্তু এখানে থাকার ছাড়পত্র তো তার নেই। সেটা যেই জানতে পারবেন মহিলা তখনই গোলমাল হয়ে যাবে। সে বলল, 'তাহলে আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা জরুরী কাজ সেরে চলে আসছি।'

'উঁহু। এখানে কারো কোন কাজ থাকতে পারে না। কাজ হল আনন্দ করা।'

'তা ঠিক। তবু দশ মিনিট সময় দিন। প্লিজ।'

অনুমতি মিলল। হরিপদ প্রায় দৌড়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে এল। না, আর কলকাতা নয়। কে তার মেয়ে কেই বা স্ত্রী? এখানেই কয়েক মাস কাটিয়ে দেবে সে। নো মোর বিজনেস।

গাড়ির সামনে সতীকান্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'না মশাই, ওই নামে কোন ভক্ত কলকাতা থেকে আসেনি।'

'ও। শুনুন, এখানে দীক্ষা নিয়ে কিভাবে আবাসিক হব বলুন তো?'

'ছ' মাস নিয়মিত আসতে হবে। স্বামীজি যদি আপনার আচরণের বর্ণনা শুনে খুশি হন তাহলে অনুমতি পেতে পারেন। অবশ্য বিদেশীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তারা এলেই এখানে থাকতে পারে। তবে মদ্যপান এবং সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ।'

খুব মন খারাপ হয়ে গেল হরিপদর। বারবারা ফুল গাছের ঝোপের পাশে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। শালা, ভারতবর্ষে জন্মানোর জন্যে কত কি হারাতে হয়।

ওরা হরিদ্বার এসে পেঁছাল সন্ধে নাগাদ। বাজারের কাছে নেমে গেল হরিপদ। তার কেবলই মনে হতে লাগল জীবনটাই বৃথা। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর হঠাৎ খেয়াল হল ট্রেনে সহ-যাত্রী বলেছিলেন হরিদ্বারে আর একজন স্বামী আছেন। কনখলে তাঁর আশ্রম। বিমল যোশী তাঁর শিষ্য নয় তো? সেখানে গেলে কেমন হয়?

এক্কা নিল সে। হরিদ্বার থেকে গঙ্গার ওপর ব্রীজ পেরিয়ে সে চলে এল কনখলের পথে। পুরোন শহর। মন্দিরে মন্দিরে ছয়-লাপ। টাঙ্গাওয়ালাই হদিশ দিল। তুলসীদাস স্বামীর আশ্রম পুরোন গঙ্গার গা ঘেঁসে। তবে তিনি নাকি খুব অসুস্থ। তাঁর শিষ্য সংখ্যাও অনেক।

আশ্রমের সামনে টাঙ্গা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ামাত্র তিন-জন লোক ভেতর থেকে ছুটে এসে দুহাত জড়ো করে বলল, 'আসুন, আসুন।'

হরিপদ খুব ঘাবড়ে গেল, 'মানে?'

'তাড়াতাড়ি ভেতরে চলুন, বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'বাবা?' আরও হাঁ হয়ে গেল সে। এরা নিশ্চয়ই গুলিয়ে ফেলেছে।

'প্রভু তুলসীদাস স্বামী। কদিন থেকেই বলছিলেন সে আসবে, আসতে হবে। আজ বিকেল থেকেই ছটপট করছেন। একটু আগে বললেন, সে আসছে টাঙ্গায় চেপে আসছে। ওই এল বলে।' একজন বলল।

হরিপদর মনে হল কথাগুলো যদি তার জন্যে উচ্চারিত হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ভদ্রলোকের দূরদৃষ্টি আছে। কৌতূহল হল তার। সে ওদের অনুসরণ করল। বাগান, চত্বর পেরিয়ে দুদিকে অতিথিশালা। তারপর বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। মন্দিরের

পাশ দিয়ে শিষ্যরা তাকে নিয়ে চলল গঙ্গার দিকে। সেখানে মূল আশ্রমবাড়ি। সন্ধারতি চলছে। শিষ্যশিষ্যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে সেই আশ্রমবাড়ির সামনে। ওরা পথ করে তাকে নিয়ে এল ভেতরে। দুটো ঘর পেরিয়ে গুহার মত একখানি ঘর। তাতে পেতলের প্রদীপ জ্বলছে। মাথা নিচু করে ঢুকতে হল হরিপদকে। একজন বলল, 'বাবা, উনি এসেছেন। এইমাত্র টাঙ্গা থেকে নামলেন।'

হরিপদ দেখল ঘরের একপাশে খাটিয়ায় বিছানা পেতে শুয়ে আছেন এক লোলচর্ম বৃদ্ধ। প্রদীপের আলোয় তাঁকে আরও অসুস্থ দেখাচ্ছে। কথাগুলো শোনামাত্র তিনি শীর্ণ হাত বাড়ালেন, 'আয়, কাছে আয়। ওরে তোর আসার পথ চেয়ে আমি কতকাল বসে আছি। আমার কাছে আয় রে।'

হরিপদ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। এ আবার কি? গতরাত্রে মদ্যপান করে যে গলায় সে কথা বলেছিল এই বৃদ্ধ সেই ভঙ্গিতে কথা বলছেন। যদিও এঁর শরীর শীর্ণ এবং দেখলেই বোঝা যাচ্ছে খুবই দুর্বল। চারজন প্রবীণ মানুষ বৃদ্ধের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ আবার বললেন, 'ওরে তোর এখনও আড় ভাঙল না? আমার সময় যে আর বেশি নেই। আয়। কাছে আয়। এখানে, এখানে।' তিনি তাঁর পাশের জায়গাটা কাঁপা হাতে দেখিয়ে দিলেন। হরিপদ শিহরনবোধ করল। মানুষটির গলায় স্বরে এমন একটা আকুতি ছিল যে সে আর উপেক্ষা করতে পারল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নিজের অজান্তেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল কাছে। বৃদ্ধ ওর মুখে মাথায় বুকে হাত বোলাতে লাগলেন শায়িত অবস্থায়। তারপর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, 'আর আমার কোন চিন্তা নেই। তুই এসে গেছিস। শোন, এখন থেকে সব দায়িত্ব তোকে নিতে হবে। তুই হবি আমার উত্তরসূরী। তোমরা সবাই শুনছ?'

চারজন মানুষ প্রায় একই সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বাবা।'

হরিপদ আঁতকে উঠল, 'কিন্তু আমি তো কিছুই জানি না।'

'জেনে নিবি। তোর জানতে সময় লাগবে না। তোর গত জন্মেই সব জানা হয়ে গিয়েছে। একটু ভোগ ছিল, এতদিন তাই ভুগে এলি। আগুনে ছাই চাপা ছিল, এই ফুঁ দিলাম, সব ছাই উড়ে গেল। ওরে, আয়োজন কর। আর সময় নেই।' তুলসীদাস স্বামী চোখ বন্ধ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই চারজন প্রধান শিষ্য এগিয়ে এলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী এখন থেকে সমস্ত দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হবে। প্রথমে আপনি বেশ পরিবর্তন করে নিলে সুবিধা হবে।'

'বেশ ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল হরিপদ।

'আজ্ঞে, এখন আপনার সংসারীর বেশ।'

হরিপদর মাথার ভেতরে কোন চিন্তা করার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। আচ্ছন্নের মত সে একজন শিষ্যকে অনুসরণ করল। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন যে ঘরটিতে সেখানেই তুলসীদাস স্বামী বাস করতেন তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ঘরটিতে তেল চকচকে তক্তাপোশ, একটি ছোট আলমারিতে অনেকগুলো বাঁধানো বই যার নীচের তাকে কয়েকটি কাপড়। শিষ্যটি তাকে সেই কাপড় থেকে দুটি পরতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নমস্কার করে। হরিপদ পোশাক বদল করল। সঙ্গে সঙ্গে শরীর-মন অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল। নিজের সংসারী পোশাককে এ ঘরে খুবই বাহুল্য বলে মনে হচ্ছিল। সেগুলোকে ঘরের এককোণে ফেলে দেওয়ার সময় তার খেয়ালই হল না পকেটে মানিব্যাগ এবং কিছু কাগজপত্র রয়েছে।

মাথা নিচু করে বাইরে বেরিয়ে আসতেই শিষ্যটি তাকে আবার তুলসীদাস স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। তিনি তখন ইষ্টনাম জপ করছেন। তাকে দেখে তিনি ইশারায় কাছে ডাকলেন। হরিপদ এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতেই মাথায় হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চারটি শব্দ উচ্চারণ করলেন মৃদু স্বরে। সঙ্গে সঙ্গে

আনন্দে ভরে গেল বুক, ফেলে আসা দিনগুলো জীর্ণ পাতার মত উড়ে যেতে লাগল। তুলসীদাস স্বামী এবার বললেন, 'আজ থেকে তোর নাম সুন্দর, সুন্দর স্বামী। শেষদিন না আসা পর্যন্ত আমার কাজ তুই করে যাবি। এবার আমি উঠব।'

শিষ্যরাই সব ব্যবস্থা করল। পালকি নিয়ে আসা হল। বিশাল পালকি। তার ভেতরে তুলসীদাস স্বামীকে শোওয়ানো হল। শিষ্যদের অনুরোধে হরিপদ সেই পালকিতে উঠে তাঁর পায়ের কাছে বসল। তার দুটো হাত এখন পদসেবা করছে। পালকি রওনা হল। পেছনে সামনে হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য।

পালকি দুলছে। সমানে জয়ধ্বনি চলছে বাবার নামে। তুলসীদাস স্বামী হাত নেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বললেন, চলন্ত পালকিতে সেটা করা বেশ কষ্টের, তবু হরিপদ আদেশ পালন করল। তুলসীদাস স্বামী বললেন, 'প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগেই জাগ্রত হবে। সেই সময় আমাকে স্মরণ করবে। তোমার জীবনে যা কিছু অন্ধকার তা আমাকে স্মরণ করলেই দূর হবে। আমার ঘরে যা বইপত্র আছে নিয়মিত প্রতি রাত্রে তা অধ্যয়ন করবে। আমার নিজস্ব মতামত লেখা আছে একটি খাতায়। তা পাঠ করবে। সেখানে তোমার আচরণবিধি লিখে রেখেছি। সেইমত চলবে। আমার সমস্ত শিষ্যশিষ্যাদের নিজের সন্তান বলে মনে করবে।'

'এত বড় দায়িত্ব আমাকে দিচ্ছেন কেন?

'না দিয়ে আমার উপায় নেই। আমার শিষ্যদের মধ্যে কেউ উপযুক্ত নয়। একজন কাউকে আমার পাওয়া দরকার ছিল, আমার হিসেবে তুমি মন্দ নও।

'কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'এই শরীর পঞ্চভূতে বিলিয়ে দিতে।'

ক্রমশ মিছিলের আয়তন কমে আসছিল। এখন যাঁরা সঙ্গে চলেছেন তাঁরা বাবার প্রতি আন্তরিকভাবেই অনুগত। চাপা গলায়

জয়ধ্বনি চলছে। একসময় পালকি নিচে নামল। হরিপদ জলের শব্দ শুনতে পেল। বাইরে অন্ধকার। পালকি থেকে বেরিয়ে আসতেই হরিপদ দেখল বড় হ্যাজাক জ্বালা হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার এখানটায় আপাতত নেই। অদূরে নদীর জলেও আলো পড়েছে। কিন্তু তার বাইরে সব অন্ধকার। শায়িত অবস্থায় বাবাকে বাইরে নিয়ে আসা হল। হরিপদ ভেবে পাচ্ছিল না জীবিত অবস্থায় বাবাকে এখানে কেন নিয়ে আসা হল? সৎকার করতেও তো মৃতদেহ দরকার। এখন বাবার মধ্যে মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাহলে?

এর মধ্যে কয়েকজন নেমে গিয়েছে নদীতে। জল এখন বড়ো জোর এক দেড় ফুট। গঙ্গার এই অঞ্চলে স্রোত খুব কিন্তু বর্ষা না নামলে জলের সীমা বাড়ে না। নিচে ছোট বড় পাথর রয়েছে প্রচুর। তাতেই ধাক্কা খাচ্ছে স্রোত। হরিপদ দেখল পাড় ভেঙে যেখানে অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে নদী এবং স্বাভাবিক ভাবেই স্রোতের তেজ কম সেখানে পাথর সাজানো হচ্ছে। বাবার জয়ধ্বনি চলছে সমানে। তিনি চোখ বন্ধ করে জপ করে চলেছেন। এবার সেই চারজন শিষ্যের একজন হরিপদকে বললেন, 'বাবা সমস্ত আদেশ দিয়ে রেখেছেন। তবু আমাদের রক্ষক হিসেবে আপনি বাবাকে প্রশ্ন করুন যে তিনি মত পরিবর্তন করবেন কিনা?

ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা না করে হরিপদ করজোড়ে বাবাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি এখনও মত পরিবর্তনের কথা ভাবছেন না?'

বাবা শায়িত অবস্থায় চোখ বন্ধ করেই মাথা নাড়লেন, না। অতএব জয়ধ্বনির সঙ্গে চার প্রধান শিষ্য বাবাকে কোলে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে জলের দিকে এগিয়ে গেল। হরিপদ তাঁদের সঙ্গী হল। তার কৌতূহল বাঁধ ভাঙছিল। হাঁটু জলের কাছে গিয়ে বাবাকে জলে নামানো হল। তিনি হরিপদর দিকে হাত বাড়াতেই সে জলের ভেতরে এগিয়ে গেল। তাকে আঁকড়ে ধরে থর থর করে

কাঁপতে লাগলেন বাবা। তারপর ধীরে ধীরে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে তিনি বাবু হয়ে বসে পড়লেন। জল তাঁর গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল। মাথা জলের ওপরে। একজন শিষ্য একটি বড় পাথর তুলে হরিপদর হাতে দিয়ে বলল, 'এটিকে বাবার কোলে রেখে দিন আপনি, আমরা তারপর সাজিয়ে দিচ্ছি। নইলে স্রোতের টানে শরীর হেলে পড়বে।'

পাথরটির ওজনে হরিপদ নুয়ে পড়ছিল। এমনিতেই শীতল জলে তার কাঁপুনি হচ্ছিল। সে কোন কথা ব্যয় না করে বাবার কোলে পাথরটি নামিয়ে দিতেই অন্যরা বাবার শরীরের আশেপাশে পাথরের ঠেকা দিতে লাগল। বাবার চোখ বন্ধ। ঠোঁট কাপছে। বোঝা যাচ্ছে তিনি সমানে জপ করে চলেছেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'সুন্দর, এবার তুমি আদেশ দাও সবাইকে আশ্রমে ফিরে যেতে। এখন থেকে আমাকে মৃত বলে ভেবে নেবে সবাই। আমাকে একা থাকতে দাও।'

হরিপদর মনে হল এটা আত্মহত্যা। সে প্রতিবাদ করতে গেল। কিন্তু তার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। ভক্তরা শিষ্যরা প্রণাম করতে করতে যখন জল ছেড়ে উঠে গেল তখন সে তাঁদের অনুসরণ করল। তীরে উঠে সে হ্যাজাকের প্রলম্বিত আলোয় দেখল গঙ্গার ধারা বাবার গলা স্পর্শ করে বয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে আছেন শক্ত হয়ে। তাঁর চোখ বন্ধ। হরিপদ বলতে বাধ্য হল, 'উনি আমাদের আদেশ করেছেন আশ্রমে ফিরে যেতে। এই আদেশ মান্য করা আমাদের কর্তব্য।'

আবার বাবার নামে জয়ধ্বনি উঠল। তারপর সেই চার শিষ্যের একজন বললেন, স্বামীজি, আপনি অনুগ্রহ করে এবার পালকিতে উঠে বসুন।'

'কেন? আমি পালকিতে যাব কেন?'

'সেটাই নিয়ম। বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বরণ করতে হয়।'

'কিন্তু এখানে কারা থাকবে ?'

'কেউ না। বাবা একলা থাকতে চান।'

'কিন্তু আমাদের তরফে ওঁকে—।'

'এটাই নিয়ম। এইভাবেই একসময় ওঁর আত্মা জীর্ণ শরীর ছেড়ে চলে যাবে।'

'আমি, আমি ভাবতে পারছি না।'

'নিজেকে শক্ত করা এখন আমাদের পবিত্র কর্তব্য। আপনি আসন গ্রহণ করুন।'

হরিপদ পালকিতে উঠে বসল। কোন কিছুই বোধবুদ্ধিতে আসছিল না। হিন্দু সাধকরা মারা গেলে দাহ করা হয়। কোন ক্ষেত্রে সে সমাধি দেবার কথাও শুনেছে। হঠাৎ তার খেয়াল হল, প্রবীণ সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের একটি লেখায় এমন জল-সমাধির কথা পড়েছিল। কিন্তু সেটা চোখের সামনে দেখতে পাবে এমন ধারণা হয়নি। চোখ বন্ধ করেও বাবার জলে বসা শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছিল। তাঁর মুখে কি প্রশান্তি।

আশ্রমে ফিরে এল ওরা। এখন সন্ধে পার হওয়া রাত। মধ্য-রাত এগিয়ে আসছে। বাবার শরীর যতক্ষণ প্রাণহীন বলে আবিষ্কৃত না হবে অথবা আগামীকাল মধ্যাহ্নের আগে ওই জায়গায় গিয়ে যদি দেখা যায় বাবার শরীর জলে ভেসে গিয়েছে, তবেই আশ্রমে উনুন জ্বলবে। আহারের প্রশ্ন তার আগে নেই। হরিপদর অবশ্য খিদে একটুও হচ্ছিল না।

আশ্রমে আসার পর বাবার প্রধান শিষ্য হরিপদকে আসনে বসিয়ে তার সামনে করজোড়ে বসলেন। প্রবীণতম বললেন, 'বাবা আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করছেন। আপনার মধ্যে অবশ্যই একজন পবিত্র সাধক বিরাজ করছেন। এখন থেকে আপনি আমাদের পিতা হিসেবে পরিগণিত হবেন। আমরা আপনার সন্তান। আপনার পূর্বাশ্রমের কথা নিশ্চয়ই আর স্মরণে রাখবেন

না। আপনার সাধনাজীবন এখন থেকেই শুরু হবে। এ বিষয়ে বেশি বলছি বলে ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। যেসব বিষয় আপনার জানা নেই আমরা তা সম্পাদন করতে সাহায্য করব। আপনি এখন থেকে হাজার হাজার ভক্তের আত্মিক দায়িত্ব নেবেন।'

হরিপদ বলল, 'হয়তো আমার কিছুদিন সময় লাগবে। কিন্তু উনি আমার ওপর যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তার মান নিশ্চয়ই রাখব। বাবা যেভাবে আশ্রমের কাজ আপনাদের দিয়ে পরিচালনা করতেন এখন তাই হবে।'

প্রবীণতম শিষ্য বললেন, 'পিতা, অনুগ্রহ করে আমাদের আপনি বলবেন না। আমরা আপনার সন্তান।'

বাবার শোওয়ার ঘরে ঢুকল হরিপদ। একদম একা একটি বড় পেতলের প্রদীপের আলোয় খাটে বসে সে সমস্ত ব্যাপারটাকে স্বপ্নের মত মনে করল। কিন্তু স্বপ্ন তো এক্ষেত্রে বাস্তব। তার মনে তনিমা বা সন্ধ্যা আসছে না। এতদিন সে কি করে সংসারে ছিল? মনে হল গত জন্মের অসমাপ্ত কাজ সে এতদিনে সমাপ্ত করার সুযোগ পাচ্ছে। এই জীবনে মাঝখানের সময়টা নেহাতই বাহুল্য। সে উঠে আলমারি থেকে প্রথম বইটি বের করল। গীতা। সেটাকে রাখল। এসব তাকে পড়তে হবে। এবার বাবার নিজের হাতে লেখা খাতায় চোখ রাখল। বাবা লিখেছেন, 'এই যে আমি খেয়ে পরে দিব্য বেঁচে আছি, কেন বেঁচে আছি? না, ভগবান আর মানুষের মধ্যে আমাকে সেতুবন্ধন করতে হবে বলেই আমার এই বেঁচে থাকা। ভগবান কি? মানুষের সততা, মানুষের নম্রতা, মনের পবিত্র প্রকাশ। দয়া ভালবাসা প্রেম হল ভগবানের নানান চেহারা। একশ আট নামে তাঁকে পাওয়া যায় মানুষের আচরণে। অথচ মানুষ তার মূর্খতা এবং অজ্ঞতা দিয়ে সেই ভগবানকে আড়াল করে রাখে। সেই আড়াল সরাতে হবে। মানুষের মনে ভয় আছে। ভয় কি! না যম। যম ভগবান নয়, রাক্ষসও নয়। অথচ ভগবানের

খুব কাছের জন তিনি। মানুষ যদি ভয় পেয়েও তার ভেতরের ভগবানকে আবিষ্কার করে তবে মনে রাখতে হবে সেটাই স্বাভাবিক। যম তো আত্মাকে স্বর্গে পাঠান। আবার মনে রাখতে হবে যম নরকের দ্বারও দেখিয়ে দেন। ভয় মানুষকে অনেক নিচে নামিয়ে দিতেও পারে।'

মুগ্ধ হয়ে গেল হরিপদ। চোখ বন্ধ করে বসে রইল সে। এবং তখনই বন্ধ চোখের সামনে জলসমাধি নেওয়া বাবার শরীর ভেসে উঠল। বাবা এখন কি করছেন? তিনি কি বেঁচে আছেন? ওই ঠাণ্ডা জলে নগ্ন শরীরে কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারেন এক বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষ? হরিপদকে টানতে লাগলেন বাবা। মানুষের শরীরে যদি ভগবানের বাস আর দয়া মায়া তাঁর প্রকাশ তবে সে এখানে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। অন্তত বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করতে পারে কেন তিনি তাকে নির্বাচন করলেন উত্তরাধিকারী হিসেবে? কোন গুণ তিনি দেখেছেন তার মধ্যে? গত জন্মে কি কাজ করেছিল সে? বাবার প্রাণ চলে গেলে এসব অজানা থেকে যাবে। সে বাবাকে বলবে একজন ব্যবসায়ীর সন্ধানে নেহাত আর্থিক প্রয়োজনে সে এসেছিল হরিদ্বারে।

আশ্রম নিস্তব্ধ। হরিপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। দীর্ঘপথ। কখনও দৌড়ে কখনও হেঁটে সে এগিয়ে যেতে লাগল। তার পায়ে রক্ত ঝরল। শেষ পর্যন্ত সে যখন জায়গাটায় পেঁছিল তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। অন্ধকার চারধারে জমাট। নদীর জল দেখা যাচ্ছে না। তার মনে হল সে সঠিক জায়গায় এসেছে। গলা তুলে সে চিৎকার করল, 'বাবা।' নদীর ওপর দিয়ে সেই ডাক ভেসে গেল। কোথাও কোন সাড়া নেই। ক্রমশ তারার আলোয় চোখ অভ্যস্ত হল। সে জল দেখল। মনে হল জলের উচ্চতা বেড়েছে। একটি মানুষের নাকের তলা ছুঁয়েছে। সে পাগলের মত জলে নামল। কাছে পেঁছে ভুল ভাঙল। মানুষ নয়, পাথরে আটকানো গাছের মোটা ডাল।

অনেকক্ষণ জলের মধ্যে, স্রোতের মধ্যে খুঁজে খুঁজে সে হতাশ এবং অসাড় হয়ে এল। ঠাণ্ডা জলে তার বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। বাবা কোথাও নেই। পাড়ে উঠে এল সে। কাঁপুনি আসছে শরীরে। তার মনে হল পিতার মৃত্যুর মুহূর্তে সন্তানের যা পিতৃদায় তার সময়সীমা বড়ো জোর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পর্যন্ত। তারপর পিতার সংসার নিজের হয়ে যায়। পিতার দায় নিজের দায়।

সুন্দর স্বামী তাঁর আশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন ঊষালগ্নে।

॥ দুই ॥

হরিপদ কলকাতার বাইরে গেলে বেশি দিন থাকে না। আর সে না থাকলে সন্ধ্যা আজকাল একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তো বটেই বাড়ি ফিরলে কি খেতে দেওয়া হবে সেই দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়। সকালের খাওয়া নিয়ে কোন ঝামেলা হয় না কিন্তু রাত্রে কিসে হরিপদর রুচি হবে তা ভেবে পায় না সে। যাই মেনু হোক মুখ ব্যাজার করে হরিপদ। অবশ্য ইদানীং প্রায়ই রাত্রে বাইরে খেয়ে আসছে। এত পার্টি কে দেয় জানে না সন্ধ্যা, তবে জিজ্ঞাসা করলেই পার্টির কথা শুনতে হয়।

সাতদিন চলে গেলে টনক নড়ল। তার একার নয়, মেয়েরও। তনিমা কলেজ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, আজও বাবার চিঠি আসেনি ?'

সন্ধ্যা মাথা নাড়ল। মেয়ে বড় হয়েছে। বাবার সঙ্গে বেশি ভাব। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে ওর সঙ্গে একটু সমীহ করেই কথা বলে সন্ধ্যা।

'কি হল বল তো ? আমাকে বলে গেল ম্যাক্সিমাম ছয়দিন। তোমাকে কিছু বলেছে ?'

'আমাকে মানুষ মনে করে যে বলবে!' অভিমান ছিটকে উঠল গলায়।

'তুমি জিজ্ঞাসা করোনি?'

'খেয়াল ছিল না। তাছাড়া প্রত্যেকবার আমিই জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন?'

'তোমাদের এই কম্যুনিকেশন গ্যাপটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে।'

সন্ধ্যা হতভম্ব। সে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'তোমার মনে হয় বাবা তোমাকে উপেক্ষা করছে তাই দূরে সরে থাকার চেষ্টা করছ। আর বাবার বিশ্বাস তুমি তাঁর উপযুক্ত হবার চেষ্টাই করো না। দুজনের কেউ কাউকে বুঝতে চেষ্টা করেছ কখনও?'

'তোকে এসব বলেছে?'

'কে বাবা? ইম্পসিবল্। আমার সঙ্গে এসব আলোচনা করতে বাবার প্রেস্টিজে লাগবে।'

'ঠিক আছে, তোকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। নিজের পড়াশুনোটা মন দিয়ে করে আমাদের উদ্ধার করো, তাহলেই হবে। তোর বয়সে বাবা-মায়ের সমালোচনা করার সাহসই কখনই হত না আমাদের।' সন্ধ্যা সরে যাচ্ছিল মেয়ের সামনে থেকে।

তনিমা তাকে আটকালো, 'আশ্চর্য! তুমি রাগছ কেন? তুমি বাবা আর আমি, এই নিয়ে আমাদের সংসার। যতদিন ছোট ছিলাম, বুঝতাম না কিছু, তদ্দিন কিছু বলিনি। এখন তোমাদের দুজনের কাজের জন্যে যদি সংসারে অশান্তি আসে তাহলে তা থেকে তো আমিও বাদ পড়ব না। বল, পড়ব?'

'তুই কি বলতে চাইছিস?'

'তুমি একটু বাবার পছন্দ নিয়ে ভাবো।'

আমি তোমার বাবার পছন্দ নিয়ে ভাববো আর তিনি আমার

কোন পছন্দের দাম দেবেন না, এ হতে পারে ? এই যে, রোজ রাত্রে বাইরে খেয়ে আসে, কই তার বেলা তো ওকে বলিস না আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে ?'

তনিমা সন্ধ্যার হাত ধরে সোফায় টেনে আনল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার পছন্দের লিস্টটা আমাকে বল।'

মজা লাগছিল সন্ধ্যারও। এই মেয়েকে পেটে ধরেছে, জন্ম দিয়েছে, রাত জেগে বড় করেছে, আর সেই মেয়ে আজ তাকে প্রশ্ন করছে একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে। ও যেভাবে তাকাচ্ছে তাতে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় সন্ধ্যার। তার অনেক ভাবভঙ্গির সঙ্গে তনিমার খুব মিল আছে।

তনিমা জিজ্ঞেস করল, 'কি হল ? বল ? আমি লিখে নেব।'

সন্ধ্যা হাসল. 'বিয়ের পর থেকে, তুই যখন আসিসনি, তখন থেকে আমি বলে বলে হয়রান হয়ে গেছি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। এখন আর বলতে ইচ্ছে করে না।'

'তাহলে বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে তুমি খুশি ?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ও আসবে না। পৃথিবীর সব জায়গায় সময় কাটানো যায়, শুধু বাড়িতে আসার কথা বললেই অ্যালার্জি হয়।'

'কখন এলে তুমি খুশি হবে ?'

'সাতটার মধ্যে। এসে চা খেয়ে আবার বেরুক, তাতে আমার আপত্তি নেই।'

'ও। একটা হল, আর ?'

সন্ধ্যা চোখ বন্ধ করল। কত কি বলার ছিল কিন্তু কোন কিছু এখনই মনে পড়ছে না। ছোট ছোট অনেক অভিযোগ ধীরে ধীরে জড়ো হয়ে বিশাল হয়ে গিয়েছে। সেসব এখন এই মুহূর্তে বলতেও খারাপ লাগল। তাছাড়া এমন অনেক কথা আছে যা

কাউকে বলা যাবে না। সে মাথা নাড়ল, 'ওইটুকু করলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।'

'ঠিক আছে বাবা ফিরলে বলব তুমি যেখানেই যাও সন্ধেবেলায় একবার বাড়িতে ঘুরে যেও। ব্যাস?' তনিমা জিজ্ঞাসা করল।

সন্ধ্যা হাসল, 'দ্যাখ পারিস কিনা। হ্যাঁরে, ও কিছু বলে?'

'কি ব্যাপারে?'

'আমার ব্যাপারে?'

তনিমা নাক কোঁচকালো, 'হুম্। তুমি আজকাল যত্ন করে রান্না করো না।'

'তা তো বলবেই। বড় বড় হোটেলের খাবার খেয়ে মুখ তো পাল্টে গিয়েছে?'

'তুমি একটুও সাজগোজ করো না।'

'মানে?'

'বাঃ, তোমার পাকা চুল দেখা দিচ্ছে, কলপ দিলে ঠিক হয়ে যায়।

'আমার কত বয়স হল জানিস? পঞ্চাশ হতে দেরি নেই।'

'বাংলা ছবির একজন নায়িকা তোমার থেকে বয়সে বড়, তা জানো?'

'বেশি পাকামি করিস না। তোর বাবা যেন পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে দিয়েছে। তোদের এই সংসারে বিনা মাইনের ঝিগিরি করে এর চেয়ে ভাল থাকা যায় না।'

তনিমা দ্রুত মাথা নাড়ল, 'তোমাকে এই ভাষায় কথা বলা বন্ধ করতে হবে।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল সন্ধ্যা।

'বিনা মাইনের ঝিগিরি বলতে যা বোঝাচ্ছ তা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা বলেন না।'

'ইস্। আর এই বয়সে আমাকে কথা বলা শেখাতে আসিস না।'

'এইখানেও আপত্তি। বিলো ফিফটি অথচ এমন বয়স বয়স করছ যেন তুমি প্রচণ্ড বৃদ্ধা। বাবাকে দ্যাখো না, কি স্মার্ট, কি হ্যাণ্ডসাম।'

'আমার তো আর ভীমরতি হয়নি যে খোকা সেজে থাকব।'

তনিমা রেগে গেল, 'আচ্ছা, বাবা যদি জবুথবু বুড়ো হয়ে যেত তাহলে তোমার ভাল লাগত? মনে মনে খুশি হতে তুমি?'

'জবুথবু হতে কে বলেছে? তাই বলে যে বয়সে যা হওয়া উচিত তা হবে না?'

'কোন বয়সে কোনটা ঠিক তা বুঝবে কি করে?'

'বাঃ, তুই তো সেদিনের মেয়ে, বড় হ, বুঝবি।'

'আচ্ছা, তোমার বয়সে দিদিমা রঙিন শাড়ি পরতেন?'

'না।'

'তোমার মত স্টাইলে শাড়ি পরতেন?'

'কেন?'

'বল না।'

'না। তখন তো অন্যরকম রেওয়াজ ছিল।'

'তাহলে তোমার মায়ের সময়ে যেটা ঠিক ছিল এখন তা বেঠিক। অথচ বাবার ক্ষেত্রে তুমি এখনও পুরোন ভাবনাটাকেই আঁকড়ে ধরে আছ।'

সন্ধ্যা উঠে পড়ল। তার মনে হচ্ছিল মেয়ের সঙ্গে এত কথা না বললেই ঠিক হত। কথা বলার নেশায় খেয়াল হয়নি কখন থামতে হবে। যা ছিল তার একান্ত ব্যক্তিগত তা মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নিজেকে খেলো করল সে। এখন এই মেয়ে কি আর তাকে মানবে? নিশ্চয়ই ও পক্ষ থেকে মেয়েকে উসকে দিয়েছে বাইরে যাওয়ার আগে।

নিজের ঘরে ঢুকে শরীর জ্বলতে লাগল সন্ধ্যার। স্বামী ছাড়া মেয়েকে নিয়েও সে খুব দুশ্চিন্তায় ভুগছে। এখন তো মেয়ে

তাকে আরও পেয়ে বসবে। কলেজে ভর্তি হবার আগে মেয়ে ছিল খুব শান্ত ভীরু প্রকৃতির। মাসখানেক কলেজ করার পর মেয়ে আমূল বদলে গেল। মাইল খানেক দূরের কলেজ থেকে বাড়ি আসে বন্ধুদের সঙ্গে হাঁটিতে হাঁটিতে। আর বন্ধু মানে মেয়েই শুধু নয়, সমবয়সী ছেলেও আছে। তার আপত্তি এখানেই। মেয়ে অনেক আছে কলেজে, তাদের সঙ্গে মেশো, তা নয় এই বয়সে মেয়ের বন্ধুত্ব হয়েছে উটকোদেখতে কিছু ছেলের সঙ্গেও। কারোর দাড়ি আছে, কেউ কথা বলে কায়দা করে। আর নিজেদের মধ্যে সর্বক্ষণ তুই তোকারি।

স্বামীকে বেশ কয়েকবার বলেছে সে এই সব। কিন্তু যার মন পড়ে আছে বাইরের জগতে তার কানে ঘরের কথা ঢুকবে কি করে? বেশি বলায় বিরক্ত হয়েছিল, 'অষ্টাদশ শতাব্দীতে পড়ে থেকো না তো! কো-এডে পড়ছে, ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব তো হবেই। তা ছাড়া ওর বন্ধুরা ওরই বয়সী। তনিমা ওদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচিওরড। সমবয়সীর সঙ্গে প্রেম করার কথা ও ভাবতেও পারবে না।'

যেন ঈশ্বর কথা বললেন এমন ভঙ্গি ছিল হরিপদর। এখনও মনে পড়লে পিত্তি জ্বলে সন্ধ্যার। ওই বয়সের মেয়ে ভুল করার জন্যে পা বাড়িয়ে থাকে। মুখে পাকা পাকা কথা বললেই যেন ম্যাচিওরিটি এসে গেল? একদিন দুপুরে শাড়ির ফলস কিনতে বেরিয়েছিল সন্ধ্যা। তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখে একটা দাড়িওয়ালা ছেলের সঙ্গে তনিমা খুব গল্প করছে। বাড়িতে কেউ নেই আর একটা উটকো ছেলেকে মেয়ে ঢুকতে দিয়েছে বলে খুব রেগে গিয়েছিল সে। কিন্তু তনিমা তাকে দেখে হেসে বলেছিল, মা, এই দ্যাখো, এর নাম শ্যামলেন্দু, আমার সঙ্গে পড়ে।' ছেলেটি সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল। সন্ধ্যা কিছু বলতে পারেনি। রাগ হজম করে বসতে বলে সরে এসেছিল। কাজের

লোকের কাছে জেনেছিল ছেলেটি আধঘণ্টা আগে এসেছে। চা-ও দিতে হয়েছিল। সে চলে যাওয়ার পর তনিমাকে ডেকে খুব ধমকেছিল। বাড়িতে কেউ না থাকলে কোন ছেলেকে যেন সে ভেতরে না আসতে দেয়। সব শুনে তনিমা জিজ্ঞাসা করছিল, 'কেন?'

'আশ্চর্য! তুই কেন জিজ্ঞাসা করছিস?

অনেকটা টেনে উচ্চারণ করেছিল তনিমা, 'হুঁ্যা।'

বোঝাবার চেষ্টা করেছিল সন্ধ্যা, 'কদিন কলেজে দেখছ ওকে, কি রকম ছেলে জানো না। ও যদি তোমার ওপর কোন সুযোগ নিতে চায়?'

'মানে? সুযোগ নেবে মানে?'

'দ্যাখ তনিমা, ন্যাকামি করিস না।'

'ওঃ না। খামোকা ও সুযোগ নিতে যাবে কেন?'

'ছেলেদের বিশ্বাস নেই।'

'উফ্। আচ্ছা ধর, ও সুযোগ নিতে চাইল, আমি কি চুপ করে বসে থাকব? আমার গায়ে জোর নেই? এমন কথা বলবে না।'

অবাক চোখে মেয়েকে দেখেছিল। ওই বয়সে সে কখনই এমন সাহসী কথা বলতে পারত না। অবশ্য হবেই বা না কেন? মাঝ রাত্রে টিভিতে যেসব বিদেশী ছবি দেখানো হয় সেসব মেয়ের সঙ্গে দেখতে বসে হরিপদ। আপত্তি করেছিল সে। মেয়ে বলেছে তার বয়স আঠারো হয়ে গিয়েছে, ছবিটা প্রাপ্তবয়স্কের হলে তার দেখার পূর্ণ অধিকার আছে। মেয়ের কথায় সায় দিয়েছে বাবা। আর সন্ধ্যা সরে এসেছিল টিভির সামনে থেকে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই ভাবে চললে তনিমা খুব বিপদে পড়বে।

অবশ্য মাঝে মাঝে সে নিজের আচরণের জন্যে নিজের কাজেই লজ্জিত হয়। যেমন, কিছুদিন আগে হঠাৎ কানে এল তনিমা

বাথরুমে বমি করছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল দরজায়। চিৎকার করে জানতে চাইল কি হয়েছে? তিরিশ সেকেন্ড বাদে মেয়ে জবাব দিল, কিছু না। পরে বেরিয়ে বলল, 'হঠাৎ বমি হয়ে গেল।'

'কিছু খেয়েছিলি?'

'না।' সামনে থেকে চলে গিয়েছিল মেয়ে।

বিকেলবেলা আবার শুনল বমির শব্দ। এবং এই শব্দ তার খুব চেনা। যখন তনিমা তার পেটে এসেছে, বোঝা না বোঝার সময় তখন, এই রকম শব্দ করে বমি করত সে। লেবুর আচার খুব ভাল লাগত। সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল মেয়ের বমির শব্দ শুনে। উঠে বাথরুমের দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল তখন। মুখে যত বড় বড় কথা বলুক, একটা কিছু ঘটিয়ে যদি মেয়ে ধরা দেয় তাহলে সে কি করবে? এমনকি সেই সময় মেয়েকে ডাকতেও সাহস হচ্ছিল না।

মেয়ে বেরুল। মাকে সামনে দেখে বেশ অবাক। ভ্রু কপালে উঠল। সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'বমি হল কেন?'

'কি জানি। হজম হয়নি বোধহয়।'

প্রশ্নটা করতে গিয়েও পারল না সে। মেয়ে চলে গেলে ছটফট করল। রাত্রে হরিপদ এলে সে বলে ফেলল সন্দেহের কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল হরিপদ। সেই হাসির শব্দ কানে যেতে মেয়ে ছুটে এল এই ঘরে। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বাবা?'

সন্ধ্যার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়েছিল।

হরিপদ মাথা নেড়েছিল, 'এটা একদম ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোর শোনার নয়।'

মেয়ে হেসে চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে।

হরিপদ বলেছিল, 'তুমি এত বোকা কেন?'

'মানে?'

'ওরা ক্লাস নাইন থেকে এসব পড়ে। এমন কান্ড করবে না।'

'কিন্তু—।'

'কোন কিন্তু নয়। যদি ও জানতে পারে তুমি এসব সন্দেহ করছ তাহলে জীবনে ক্ষমা করবে না তোমাকে।'

স্বীকার করছে সে, ভুল হয়ে ছিল। তারপর কিছু সময় কেটেছে। পরের মাসে সে নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তদ্দিন যে কাঁটা হয়েছিল তাও ঠিক। এখন অবশ্য সেসব কথা ভাবলে লজ্জা হয়। অবশ্য তাই বলে মেয়েকে এমন আস্কারা দেওয়া তার মোটেই ভাল লাগে না। রাম ছিল, এখন সুগ্রীব জুটেছে।

তবে একথা সন্ধ্যারও মনে হয় সে যেমনটি চলা উচিত তেমন ভাবে চলতে পারছে না। তনিমা দূরের কথা হরিপদর সঙ্গেও তার প্রচুর দূরত্ব। আসলে সেই ছেলেবেলা থেকে বিয়ে না হওয়া বয়স পর্যন্ত ওদের বাড়ির আবহাওয়া ছিল খুব কড়া শাসনে বাঁধা। সেই অতি রক্ষণশীল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হরিপদর সঙ্গে তাল মেলাতে তার অসুবিধে হয়েছিল। রুচির তফাত থেকে একটু একটু করে ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল। হরিপদ অবশ্য এ নিয়ে কখনও সামনাসামনি ঝামেলা করেনি। করেছে সন্ধ্যা নিজেই। আর হরিপদ যতটা পেরেছে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। এসব ব্যাপার যে সন্ধ্যা বোঝে না তা নয় কিন্তু—

এই কিন্তুটাকে সে কিছুতেই উপড়ে ফেলতে পারে না। আর এতদিনেও যখন পারেনি তখন বাকি জীবনে সম্ভব নয়। হরিপদর ব্যবসার জীবনটা তার কাছে একদম অজানা। আর সেটা জানতেও চায় না সে। পুরুষমানুষের ব্যাপার মেয়েছেলের জেনে কি লাভ। শুধু একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা—হ্যাঁ, মেয়ের কাছে যে কথাটা সে বলেছে ওইটুকু পেলেই তার চলে যাবে। এতদিন যদি হরিপদর তার সাহায্য ছাড়া বাইরের জীবন চলে যেতে পারে তাহলে এখনও যাবে, মেয়ে যত কথা বলে বলুক।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তনিমা শোওয়ার ঘরে এল। ঘরের এক দেওয়ালে হরিপদর বই এর লাইব্রেরি, দুটো আলমারি ঠাসা বই। মেয়ে বাবাকে বলে মাঝেমাঝে বই নিয়ে যায়। এ ব্যাপারেও সন্ধ্যার আপত্তি আছে। বাপের তো রুচির কোন ঠিক নেই। জামাকাপড় প্রায় নেই বললে হয় এমন মেয়েদের ছবি আঁকা মলাটের ইংরেজি বই কিনে আনবে, মাঝ রাত পর্যন্ত পড়বে। বললে বলবে, 'মলাটেই এসব ছবি থাকে, ভেতরে টানটান গল্প। ওদেশের মেয়েদের ঈশ্বর শরীর দিয়েছেন ঢেকে রাখতে নয় ওটাও যে সুন্দর তা বোঝায় ওরা।' রাগে পিত্তি জ্বলে যায়। আর মেয়ে এসে নির্দ্বিধায় সেই বই নিয়ে যায় ঘরে। একদিন এই নিয়ে মেয়েকে ধমকেছিল সন্ধ্যা আড়ালে। চুপচাপ মেয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। মিনিট দুয়েক পরে একটা মোটকা বাঁধানো বই হাতে নিয়ে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি এই বইটা পড়তে পারি?'

সন্ধ্যা ঝুঁকে বইট্যর নাম পড়ে মাথা নেড়েছিল. 'ন্যাকামি করো না। যুগ যুগ থেকে আমরা এই বই পড়ে এসেছি। তুমি জানো না এটা ধর্মগ্রন্থ?'

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে পাতা খুলল, 'এই জায়গা পড়ে দ্যাখো, পড়ে বল কেমন?'

কৌতূহল নিয়ে পড়তে গিয়ে সন্ধ্যার কান লাল হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। নিঃশ্বাস গরম। ছি ছি ছি। নরনারীর মিলনের এমন বর্ণনা মহাভারতে আছে? সে কোনদিন এত মোটা বই পড়েনি। মহাভারতের ছোট সংস্করণ পড়া আছে তার। মেয়ে বলল, 'এমন বর্ণনা কিন্তু এই বই-এর অনেকটা জুড়ে আছে। তবে এটাকে ধর্মগ্রন্থ না বলে মহাকাব্য বলা উচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোর একটা। তুমি নিশ্চয়ই তোমার কথা ফিরিয়ে নেবে না।'

না, পড়া নিয়ে মেয়েকে আর কিছু বলেনি সন্ধ্যা। আজকাল

নিজেকে খুব বোকা বলে মনে হয় মাঝেমাঝে। সে চুপ করে থাকতেও তো পারে না সবসময়।

আলমারি খুলে বই দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা বড় ডায়েরি টেনে বের করল তনিমা। দুপাতা উল্টে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, দেখবে এসো তাড়াতাড়ি।'

সন্ধ্যা বিছানা ঠিক করছিল, মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'যা বলার বলে ফেল।'

'বাবা ডায়েরি লিখত, তুমি জানো ?'

'ডায়েরি ?'

'হুঁ। অন্যের লেখা ডায়েরি অবশ্য দেখতে নেই। মরে গেলে তবে দেখা যেতে পারে। পত্রিকায় দ্যাখোনি, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, অমুকের ডায়েরি এসব তো আগে ছাপা হয় না।'

'তোর মুখে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছিস।' সন্ধ্যা এগিয়ে এল, 'দেখি কি লিখেছে ও। আমার সম্পর্কেই নিশ্চয়ই।'

তনিমা সরে দাঁড়াল. 'এটা ঠিক ডায়েরি নয় মা। মানে, রোজ রোজ লেখেনি। আরেব্বাস, এই দ্যাখো। কি কাণ্ড !'

'কি কাণ্ড ?'

'বাবা দীক্ষা নিয়েছে।' বলেই হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল মেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের একেবারে ভেতরে খচ্ করে লাগল সন্ধ্যার। দীক্ষা নিয়েছে চুপিচুপি ? অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে সন্ধ্যার বড়দিরা বেনারসে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিল বলে কি ব্যঙ্গই না করেছিল। বলেছিল অত্যন্ত দুর্বল মনের মানুষ ছাড়া কেউ দীক্ষা নেয় না। প্রতিবাদ করেনি সন্ধ্যা সেদিন। জানে করে লাভ নেই। কিন্তু আজ এ কি কথা শুনছে ? দীক্ষা কেউ স্ত্রীকে বাদ দিয়ে নেয় ? দিদি জামাইবাবু একসঙ্গে নিয়েছিল। সে গম্ভীর মুখেই জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক করে বল ? ইয়ার্কি মারিস না।'

হাসি গিলতে গিলতে মেয়ে জবাব দিল, 'সত্যি মা। এই তো

লিখেছে, আজ আমি দীক্ষা নিলাম। মা ভুবনেশ্বরী আমায় দীক্ষা দিলেন।' বলে মুখ তুলে একটু ভাবল, 'এটা একদম চেপে গিয়েছে বাবা? আমার একদম বিশ্বাস হচ্ছে না। এমন হ্যান্ডসাম একটা লোক দীক্ষা নিতে যাবে কেন? বাবা তো পরলোক সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করত না। কি, তুমি জানতে ব্যাপারটা?'

মুখ নিচু করে মাথা নাড়ল সন্ধ্যা। নিজেকে ভীষণ প্রতারিত বলে মনে হচ্ছিল। ওই লোকটা তাকে মানুষ বলে মনে করেই না। মা ভুবনেশ্বরীকে সেও শ্রদ্ধা করে। তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে পারলে তার জীবন ধন্য হয়ে যেত। অথচ লোকটা একা একা সেটা নিয়ে নিল। তনিমা পাতা ওল্টাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখ বড় হয়ে গেল, 'মা!' চিৎকার করে উঠল সে।

সন্ধ্যা কোনমতে মুখ তুলল। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

'বাবা আর একজনের কাছে দীক্ষা নিয়েছে। পাথরবাবা।'

'সে কি?' হাঁ হয়ে গেল সন্ধ্যা। দুটো গুরু কারো থাকে নাকি?

'হ্যাঁগো। দুটো দীক্ষার মধ্যে বেশি দিনের ব্যবধান নেই।,

'তোর কথা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছি না।' সন্ধ্যা বলতে পারল।

'এই দ্যাখো। বাবার নিশ্চয়ই মাথার ঠিক ছিল না মা।'

'কেন?'

'এই যে এখানে একটা কমপ্লিট লিস্ট আছে। বাবা, এক দুই তিন, উরেব্বাস, কতগুলো গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েছে দ্যাখো।'

'নিতে গিয়েছে না নিয়েছে?' অবিশ্বাসে সন্ধ্যার স্বর কাঁপল।

'নিয়েছে। কতগুলোর ডেট দেখছি একেবারে গায়ে গায়ে। বাবা এত ধার্মিক হল কবে থেকে মা? আমি তো এমন কথা কখনও শুনিনি।'

'পাগল ! অথবা মিথ্যে করে লিখেছে।'

'মিথ্যে লিখতে যাবে কেন ? আচ্ছা, বাবা কি এই ঘরে বসে ধ্যানট্যান করত ?'

'কক্ষনো না। পুজোর কথা বললে ক্ষেপে উঠত।,

'সেই লোক ডজন ডজন দীক্ষা নিল ?'

'পাগল কি সাধে বলছি।' হঠাৎ সন্ধ্যা আবিষ্কার করল তার বুকে সেই কষ্টটা নেই। এমন কাণ্ড শোনার পর মনে হচ্ছে তাকে সঙ্গে গিয়ে দীক্ষা না দেওয়ার কথা যে হরিপদ বলেনি সেটা খুব সৌভাগ্যর।

'নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে মা। একবার এই সব গুরুদের আশ্রমে যাবে ?'

'ওমা, কেন ?'

'বাবা সত্যি সত্যি দীক্ষা নিয়েছিল কিনা জানতে ?'

'আর উনি ফিরে এসে যখন শুনবেন তখন কি ঘটবে ভেবেছ ?'

'উঃ তুমি খামোকা বাবাকে ভয় পাও। আমি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বললে বাবা কিছুতেই রাগ করবে না। আচ্ছা।' হঠাৎ চুপ করে নতুন পাতার লেখা পড়তে লাগল তনিমা। সন্ধ্যা কৌতূহলী হল।

তনিমা মুখ তুলল, 'বাবা হরিদ্বারে গিয়েছে দীক্ষা নেবার জন্যে। সে গুরু। 'স্বামী' লেখা। ওঃ আমার খুব মজা লাগছে। গুরু করার ব্যাপারে বাবা বোধহয় একটা রেকর্ড করতে চায়। পৃথিবীতে যারা উদ্ভট ব্যাপার করে তাদের নাম গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে ওঠে। বাবা নিশ্চয়ই সেখানে নাম তুলতে চায়।'

'ঠাকুর দেবতা নিয়ে রসিকতা হচ্ছে।'

'না, ঠাকুরদেবতা নয়। গুরুরা দেবতা কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। অবতারদের কখনই ভগবান বলা হয় না, জানো।'

'কবে আসবে কিছু লিখেছে ?'

'না। শুধু শেষ কথা হল, এবার যদি সফল হই তাহলে ওদের নিয়ে সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে কাটিয়ে যেতে পারব। কি ব্যাপার? গুরু করার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? মা, কেস খুব গোলমালের বলে মনে হচ্ছে।'

'সফল হই মানে কি রে? আমারও কেমন লাগছে।' সন্ধ্যার গলা সরু হয়ে গেল।

তনিমা একটু ভাবল, 'ঠিক আছে। চিন্তা করো না, কাল আমি অফিসে গিয়ে খোঁজ নেব বাবা কি কাজে গিয়েছে এবং কবে আসবে।'

'দ্যাখ, ঘরের লোক কবে ঘরে ফিরবে তা অফিসে গিয়ে জানতে হচ্ছে। হ্যাঁ রে, সত্যি তোকে কিছু বলে যায়নি?'

'না মা।' তনিমা বলতে চাইল এটা সন্ধ্যার জানার কথা। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে নেই তা সে এই বয়সেই শিখে ফেলেছে।

পরদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে তনিমা হরিপদর অফিসে গেল। বড়বাবু তাকে চিনতেন। বাড়িতে আসতে হয়েছে তাঁকে অনেকবার। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'না মা, কবে ফিরবেন ঠিক করে বলে যাননি। যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন দিন ছয়েকের মধ্যে ফিরে আসবেন। এখানেও অনেক জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে।'

'ঠিক কোন্ জায়গায় গিয়েছেন উনি?'

'হরিদ্বারের টিকিট কাটা হয়েছিল।'

'হরিদ্বারে আপনাদের কি ব্যবসা?'

'না। সরাসরি কোন ব্যবসা নেই। তবে ওঁর সঙ্গে অনেক নামকরা মানুষের ইদানীং আলাপ হচ্ছে যাঁরা বিভিন্ন গুরুর শিষ্য। ওইরকম একজন শিষ্যের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে উনি হরিদ্বার

অঞ্চলে কোন গুরুর কাছে গিয়েছেন। বড়বাবু কথাটা বলেই বুঝলেন বেশি বলা হয়ে গেল, 'তুমি মা এসব কারো সঙ্গে আলোচনা করো না। তোমার বাবার কানে গেলে রাগ করবেন।'

পনেরো দিনেও যখন হরিপদর দেখা পাওয়া গেল না তখন অবস্থা খুব ঘোরালো হল। আত্মীয় স্বজনদের কাছে খবর পেঁছালো। সন্ধ্যা প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তনিমার এক মামা বললেন থানায় ডায়েরি করতে। করা হল। খবরের কাগজে হরিপদর ছবি ছাপা হল। বাঙালি ব্যবসায়ী উধাও। কাগজগুলো নানান গল্প ছাপতে আরম্ভ করল। রিপোর্টারদের তাগাদায় প্রাণ ওষ্ঠাগত তনিমাদের। এর মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। গত কয়েকমাসে হরিপদ তিনলক্ষ টাকার ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছে সন্ধ্যার সঙ্গে যুগ্মভাবে। সন্ধ্যাকে দিয়ে মাঝেমধ্যে সে যে সইটই করিয়ে নিত তা যে এই কারণে এখন বোঝা গেল। ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে হরিপদ বাহান্ন হাজার টাকা রেখে গিয়েছে। অফিসের অ্যাকাউন্টেও বেশ কিছু টাকা আছে। ব্যাঙ্কের আকাউন্ট থেকে যেহেতু সন্ধ্যার সইতে টাকা তোলা যাবে তাই এখনই আর্থিক কষ্টে পড়তে হচ্ছে না ওদের।

এত সব হল কিন্তু মানুষটির খবর পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশও কোন তথ্য দিতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা একদিন তনিমাকে বলল, 'তোর মামাকে বল টিকিট কাটতে, আমি হরিদ্বার যাব। নিজে খুঁজব।'

তনিমা লাফিয়ে উঠল, ঠিক বলেছ। বাবা ডায়েরিতে হরিদ্বারে 'স্বামী' নামে একজনের কথা লিখেছিল। চল, আমরা সেখানেই খোঁজ করি।'

বাঙালী হুজুগের জাত। সেই সঙ্গে কেচ্ছার গন্ধ পেলে তার নাক খুব আরাম পায়। যারা কখনও এদিকে আসার সময় পেত না তারা এখন ঘনঘন আসছে। নানান বিষয় আলোচনায় উঠছে। এই

মধ্যবয়সে অনেকেই নাকি মোহিনীমন্ত্রে বশীভূত হয়ে সব পিছুটান ফেলে উধাও হয়ে যায়। হরিপদ সুন্দর চেহারার মানুষ, নিশ্চয়ই কোন আধুনিকা শয়তানীর নজরে পড়েছে। এতদিন ধরে ব্যবসা করছে যে তার মাত্র ওই কটা টাকা জমা থাকবে তা ভাবা যায় না। যা ছিল তার বেশির ভাগটাই হাতড়ে সে চলে গিয়েছে সেই শয়তানীর খপ্পরে।

এই সব কথা স্বাভাবিকভাবেই ভাল লাগছিল না তনিমার। সন্ধ্যার তো লাগার কথাই নয়। সে রূঢ় হল, কিছুটা মুখের ওপরই জানিয়ে দিল তার অপছন্দের কথা। এবং এক সন্ধ্যায় মেয়ে এবং ভাইকে নিয়ে রওনা হল হাওড়া স্টেশনের পথে, দুন এক্সপ্রেস ধরবে বলে। যে মানুষটা চলে গিয়ে ফিরছে না সে কেমন আছে তা তার জানা নেই, আছে কিনা না তাও, কিন্তু মন বলছিল সে দেখা পাবেই।

হরিদ্বার স্টেশনের বাইরে এসে তনিমা তার মামুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা প্রথমে কোথায় যাব বল তো?'

মামু ভদ্রলোক একটু ঘরকুনো ধরনের। নিতান্ত চাপে পড়েই সঙ্গে এসেছেন। বললেন, 'শুনেছি, এখানে অনেক ধর্মশালা আছে, একটাতে তো আগে ওঠা যাক।'

তনিমা মাথা নাড়ল, 'আমি ধর্মশালায় থাকতে পারব না।'

ইতিমধ্যে দালালরা জুটে গেল। প্রত্যেকেই লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছে। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলছে অনেকেই। শেষ পর্যন্ত সবাইকে বিমুখ করে ওরা স্টেশনের সামনে একটা হোটেলে চলে এল। দুখানা ঘর. গঙ্গাও দেখা যায় না। তনিমা নিজেকে বোঝাল সে গঙ্গা দেখতে এখানে আসেনি। সন্ধ্যার এসবে মন নেই। হোটেলে ওঠার পর থেকেই কেবল তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে বেরুবার জন্যে। মামু বললেন, 'কিভাবে খোঁজ করব তাই ভাবছি। প্রথমে থানায় গেলে কেমন হয়? ওরাই হয়তো খবর দিতে পারবে।'

'ছাই পারবে।' সন্ধ্যা বিরক্ত হল, 'ওরা তো এতদিন অনেক কিছু করেছে। আমি এখানকার সব আশ্রমে যাব। নিশ্চয়ই খুঁজে পাব ওকে।'

মামু প্রতিবাদ করল, 'তুমি পাগল হয়েছ। এখানে কত আশ্রম আছে জানো? কতদিন লাগবে সবগুলো ঘুরতে?'

তনিমার মনে পড়ে গেল, 'মামু, তুমি আমার সঙ্গে একবার চলো তো?'

মামু অসহায় চোখে তাকালেন, 'কোথায়?'

'এই হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। বয়স হয়েছে লোকটার। বাবার ডায়েরিতে 'স্বামী' শব্দটা দেখেছিলাম। ওঁর কাছে একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে।'

সন্ধ্যা বলল, 'ঠিক বলেছিস। চল, আমিও যাচ্ছি।'

ম্যানেজার সব শুনলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে বললেন, 'যদি এক নম্বর স্বামীর কাছে যান তাহলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।'

'কেন?' তনিমা জানতে চাইল।

'বিশাল এলাকা। বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা। হৃষিকেশ থেকে আর একটু ওপরে। তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। সারা পৃথিবীতে শিষ্য-শিষ্যা। সেখানে তাদের দেখতে পাবেন। আপনারা মহিলা. কি যে বলি, যৌবনের একটু বাড়াবাড়ি হয় ওই আশ্রমে।'

সন্ধ্যা বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই ওখানে আছে সে।'

তনিমা ধমকে উঠল, 'আঃ মা!'

মামু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে ওখানে যাব?'

'সকালের ট্রেনে চলে যান, সন্ধ্যায় ফিরে আসতে পারবেন।'

তনিমা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এক নম্বর স্বামী বললেন কেন?'

আর একজন ছিলেন। এখানেই, এই কনখলে। তিনি সম্প্রতি

দেহ রেখেছেন। তাঁর শিষ্যসংখ্যা অনেক। কিন্তু এক নম্বরের মত নয়। মাঝারি ধরনের গুরুদেব যেমন হয়।'

ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। হরিপদর পক্ষে হৃষিকেশে যাওয়াই স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই সেখানকার খবর কলকাতায় বসে পেয়েছে। আজ আর সময় নেই। আগামীকাল সকালেই যাওয়া ঠিক হল।

'বিকেলে হর কি-পেয়ারিতে ঘুরতে ঘুরতে তনিমা বলল, 'মা, একবার কনখলে যাবে?'

'কেন?' সন্ধ্যার খেয়াল ছিল না।

'ওই যে দুই নম্বর স্বামী? তাঁর আশ্রমটাও দেখে আসি আজ।'

মামুর মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওদের জেদে তিনি টাঙ্গা ধরলেন। পথের শোভা, মন্দির কিছুই যেন সন্ধ্যার চোখে পড়ছিল না। তার কেবলই হরিপদর মুখ মনে পড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ভিজিয়ে জল নেমে পড়ল গালে। টাঙ্গা থামল।

জিজ্ঞাসা করে করে শেষ পর্যন্ত আশ্রমে পৌঁছাল ওরা। বাবার সলিলসমাধি হয়েছে কিছুদিন আগে। যাওয়ার আগে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গিয়েছেন। এখন আশ্রম তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয়। এইসব খবর ওরা জানতে পারল। কিন্তু হরিপদ নামে কলকাতার কোন ভক্তকে কেউ কখনও দ্যাখেনি তা বলল ভক্তরা। সন্ধ্যা নিশ্চিত হল হৃষিকেশ গেলে হরিপদকে পাওয়া যাবে। ওই সব বিদেশী শিষ্যাদের সঙ্গে এই বয়সে কেচ্ছা করার জন্যেই লোকটা চলে এসেছে হৃষিকেশ। মনে যতই ক্রোধ জমুক একবার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে মরিয়া হল সে।

মামু তাগাদা দিচ্ছিলেন। সন্ধ্যা যাওয়ার আগে মন্দিরে প্রণাম করতে গেল। তনিমা ঘুরছে একা একাই। ইতিমধ্যে সে ভক্তদের কিছু আলোচনা শুনে ফেলেছে। পুরোন ভক্তদের কেউ-কেউ

অনেকদিন যাদে আশ্রমে এসেছেন। তাঁরাই আলোচনা করছিলেন। সমাধি নেওয়ার আগে বাবা নাকি ভবিষ্যৎ বাণী করছিলেন তাঁর কাছে সদ্য আগত এক ভক্তের ওপর পরবর্তীকালে দায়িত্ব অর্পিত হবে। সেইমত শেষ সন্ধ্যায় যিনি বাবার কাছে এসে পৌঁছালেন তিনি এখন আশ্রমের কর্ণধার।

গল্পটা কানে যেতেই তনিমা সচকিত হল। তার বাবাকে সে বন্ধুর মত খুব কাছ থেকে দেখেছে। এই ভক্ত নিশ্চয়ই তার বাবা নয়। বাবার স্বভাব সে ভাল জানে। কিছুতেই একজন ধর্মগুরুর উত্তরাধিকারী হিসেবে তাকে ভাবা যায় না। কিন্তু এই মানুষটি কে? এঁরা বলছেন এর আগে কেউ তাঁকে আশ্রমে দ্যাখেনি। সাধকের উত্তরাধিকার পেতে হলে নিশ্চয়ই সেই রকম যোগ্যতা থাকা দরকার। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? তনিমার আগ্রহ বাড়ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে আশ্রমের একজন স্বেচ্ছাসেবককে বলল, 'আচ্ছা, নতুন বাবা দর্শন দেবেন?'

স্বেচ্ছাসেবকটি মাথা নাড়ল, 'উনি এখন দর্শন দেবেন না।'

'কেন?'

'উনি নিজেকে পরিমার্জন করছেন। আগামী গুরুপূর্ণিমা পর্যন্ত তিনি একান্তে সাধনা করবেন। এই সময় ভক্তদের তিনি দর্শন দিতে পারবেন না।'

তনিমার খটকা লাগল। এ কি রকম ব্যাপার? নতুন বাবাকে অনেকেই দ্যাখেননি। তাঁর চালচলন সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। সে ফিরে এল মায়ের কাছে। তখন সন্ধ্যা মন্দিরে প্রণাম সেরে এসেছে। তনিমা তাকে বিশদ জানাতে সন্ধ্যা বলল, 'হ্যাঁরে, লোকটা বাঙালি কিনা তা জেনে এলি না কেন?

'জানতে হলে ভেতরে যেতে হবে। আশ্রমের কাজকর্ম যাঁরা চালান তাঁদের সঙ্গে চল দেখা করি। সাধারণ শিষ্যরা তো কিছুই জানে না।'

ওরা ভেতরে পেঁছাতে পারল না। মূল দরজায় আটকে দেওয়া হল। প্রধান শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে বলা হল একজন যেতে পারেন। সন্ধ্যা তনিমাকে ইশারা করতে সে এগিয়ে গেল। দুটি ঘর পেরিয়ে তাকে যাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল তিনি বৃদ্ধ। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। তনিমার প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হলেন, 'তাঁর পরিচয় জেনে তোমার কি লাভ হবে মা?'

'তিনি বাঙালি কিনা এটুকু জানলেই হবে।'

'কিন্তু কেন?'

'আমার বাবা হরিদ্বারে আসার কথা বলে এখানে এসে আর ফিরে যাননি। ফলে আমাদের সংসার বিপর্যস্ত।'

'তোমার বাবা কি সাধনভজন করতেন?'

'না। তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন।'

'তাহলে তাঁকে এখানে খুঁজতে এসেছ কেন? বাবা যাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছেন তিনি সাধারণ মানুষ হতে পারেন না।'

আর কোন উত্তর দিতে রাজি হলেন না বৃদ্ধ। তনিমা বাধ্য হল ফিরে যেতে।

সন্ধ্যা সব শুনে হতাশ হল। তনিমা বলল, 'কিন্তু মা, এঁরা যেন কিছু গোপন করছেন। কি করা যায় বুঝতে পারছি না।'

সন্ধ্যা বলল, 'না, হতে পারে না। তোর বাবা এত বড় আশ্রমের বাবা হবে এ আমি মরে গেলেও ভাবতে পারব না।'

তনিমা বলল, 'মরে গেলে ভাববে কি করে?'

কিছুক্ষণ বাদে হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই তনিমার চোখ পড়ল এক আশ্রমবাসিনী বৃদ্ধার ওপরে। সম্ভবত তিনি এখানে খুব সাধারণ কাজ করেন। বাঁধানো চাতালে পা ছড়িয়ে বসে পান সেজে খাচ্ছেন। তনিমা এগিয়ে গিয়ে বসল তাঁর

পাশে। হাত থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বৃদ্ধা, 'কে গো, চিনতে পারলাম না।'

'আমি আগে এখানে এসেছি।'

'ও। তা হবে। আমি তো আছি বিশ বছর।'

'আমি এতদিন বাদে এলাম কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি।'

'বৃদ্ধা হাসলেন' 'আমাকে কে চেনে মা। আশ্রমের ঘর মুছি আমি।'

'আচ্ছা' নতুন বাবাকে আপনি দেখেছেন?'

'না মা। সামনাসামনি দেখিনি। তিনি যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে কারো ঢোকা নিষেধ। নিজের হাতে সব করেন। স্বপাক খান। তবে—।'

'তবে?'

'মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি একজন চুপচাপ গঙ্গার ধার ধারে এগিয়ে যাচ্ছেন। আবার ভোরের আগেই ফিরে আসেন। আমাদের ওপর আদেশ আছে সেই সময় শয্যা ত্যাগ না করতে।'

'তাঁকে কিরকম দেখতে?'

'দেখিনি তো। মানে মুখ দেখিনি। অন্ধকার থাকে।'

'কোনদিকে যান?'

'ওই ওদিকে?' মুখ তুলে দিক বোঝালেন বৃদ্ধ।

একটা সূত্র পাওয়া গেল। তনিমা উঠে পড়ল। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে?' সে হয়তো একদম ভুল পথে ভাবছে। যদি দেখতেই হয় তাহলে মধ্যরাত পর্যন্ত গঙ্গার ধারে থাকতে হয়। সন্ধ্যাকে নিয়ে সেখানে তার পক্ষে থাকা কতখানি নিরাপদ? মামু কি রাজি হবেন? সে ফিরে যেতেই সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলল?'

তনিমা কিন্তু কিন্তু করছিল। মামু তাগাদা দিলেন, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, ফিরে চল।'

তনিমা বলল, 'তোমরা ফিরে যাও, আমি আজকে এখানেই থাকব।'

'মাথা খারাপ! আমাকে আর জ্বালিও না।' সন্ধ্যা প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল।

অগত্যা বলতেই হল। সন্ধ্যা বলল, 'কিন্তু যদি ও না হয়?'

'তাহলে কাল যেমন হৃষিকেশে যাচ্ছি তেমন যাব।'

মামুর প্রবল আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা তাকে বলতে বাধ্য হল যদি অসুবিধে থাকে তাহলে হোটেলে ফিরে যেতে পারে। মামু বাধ্য হল মেনে নিতে।

ওরা আশ্রম ছেড়ে গঙ্গার ধারে চলে এল। এর মধ্যে বেশ নির্জন হয়ে গিয়েছে চারধার। একটা গাছের বাঁধানো চাতালে বসল ওরা। সামনে গঙ্গা। পেছনের আলো একটা একটা করে নিভছে। এর মধ্যে মামু ফিরে গিয়ে কিছু খাবার কিনে এনেছিল। সেগুলো জিভে বিস্বাদ লেগেছে। রাত আরও বাড়লে মামু ওই চাতালেই শুয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত চারধার নিস্তব্ধ। পাতলা অন্ধকার পৃথিবী জুড়ে। মা ও মেয়ে পাশাপাশি বসে রয়েছে আশ্রমের দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে।

মধ্যরাত পেরিয়ে যেতে মনে হল একটি ছায়ামূর্তি আশ্রম থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছে। খুবই নির্লিপ্ত হাঁটা। যেন একটুও তাড়া নেই। দুটো হাত পেছনে, শরীর সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকা। কেউ সঙ্গে নেই।

সন্ধ্যা বলল, 'এই লোকটা নাকি? তোর বাবা তো এভাবে হাঁটে না।' ফিসফিস স্বর তার। তনিমা তার হাত চেপে ধরে চুপ করতে বলল।

মানুষটি খানিকটা দূরত্ব দিয়ে গঙ্গার বুকে নেমে যেতে লাগলেন। জল এখানে তীরের কাছে খুব বেশি নয়। আবছা অন্ধকারে তনিমা দেখতে পেল মূর্তিটি জলে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন হাত জোর করে কারো স্তব করছে।

সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। প্রায় হাত আটেক দূর থেকে সে হঠাৎ ডেকে ফেলল, 'বাবা!'

মূর্তির মুখ পাশ ফিরল। একটু সময়, তারপর জল থেকে উঠে এলেন সুন্দর স্বামী। একেবারে সামনে এসে অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করলেন, 'কিছু বলছ মা?'

গলার স্বরে তনিমা দমে গেল। তনিমা বলে উঠল, 'ভ্যাট তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কখনও কথা বলতে নাকি?'

'তুমি কখন এসেছ এখানে?' অমনি গলার স্বর হরিপদর হয়ে গেল।

'শুধু আমি নই, মা-ও আছে ওখানে।'

'কি ব্যাপার?'

'বাবা, তুমি জিজ্ঞাসা করছ কি ব্যাপার? কাউকে কিছু না বলে এভাবে চলে এসেছ, আমাদের কি অবস্থা ভাবলে না?'

'আমি এখানে থেকে যাব বলে আসিনি। এসে থাকতে হল। তবে তোমাদের অসুবিধে যাতে না হয় তার সমস্ত ব্যবস্থাই করা আছে, তাই না?'

'কিন্তু আমরা তোমাকে মিস করছি।'

'খুকি, অনেক বছর তোমাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। যা যা কর্তব্য সব করা হয়েছে। আমি লোভী অথচ কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন তার নিজের কথা ভাবা উচিত। আমি স্বার্থপরের মত তো কিছু ভাবছি না। তোমাদের স্বচ্ছন্দ্যে রেখে তবেই ভাবছি। তোমার মা বিবাহিত জীবনে প্রচুর সুখ পেয়েছেন। এখন তাঁর নতুন করে চাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে সুস্থ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে দিয়েছি। এবার আমাকে আমার মত থাকতে দাও।'

'তা নয় বাবা। তুমি হঠাৎ হাজার হাজার শিষ্যের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেয়ে লোভী হয়ে পড়েছ বলে নিজেকে পাল্টাতে চাইছ।'

'মূর্খের মত কথা বলো না। আমাকে এদের দায়িত্ব নেবার জন্যে যোগত্যা অর্জন করতে হবে। আমাকে আমার মত থাকতে দাও।'

সন্ধ্যা সব শুনছিল। হঠাৎ সে এগিয়ে এল, 'আমি ফিরে যাব না। আমাকেও এই আশ্রমে থাকতে দিতে হবে।'

'তা সম্ভব নয়। অন্য কেউ হলে আলাদা ব্যাপার হত।'

'বেশ। তাহলে আমি এই গঙ্গায় ডুবে যাব। আর ফিরব না কলকাতায়।'

ধীরে ধীরে সুন্দর স্বামীর গলা ফিরে এল, 'নিজের পথ নির্বাচন করার অধিকার তোমার আছে। কারণ ফলভোগ তোমাকেই করতে হবে।'

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল সন্ধ্যা, 'খুকি, ফিরে চল। এই লোকের জন্যে এত দূর ছুটে এসেছি বলে এখন নিজের ওপর ঘেন্না লাগছে।' সন্ধ্যা ফিরে গেল গাছতলায়। গিয়ে তার ভাইকে ডাকতে লাগল গলা তুলে।

সুন্দর স্বামী আবার হরিপদ হয়ে গেল, 'খুকি মাকে বুঝিয়ে বলিস।'

'কি বলব? আমি নিজেই তো কিছু বুঝিনি।' তনিমার গলায় জ্বালা।

'আসলে জানিস, আমি এখানে এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ওই সাধক আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেললেন, আমি তোকে খুব মিস করি রে!'

'বাঃ! মা বলছিল, তুমি যেদিন প্রথম মদ খেয়েছিলে সেদিন বাড়িতে ফিরে এসে বলেছিলে, বন্ধুরা এমন জোর করেছিল যে না খেয়ে পারেনি!'

'দুটো এক হল?'

'একই। তুমি পালাতে চাইছ। এসকেপিস্ট।' তনিমার

গলার স্বরে বাষ্প, 'আমি তোমাকে আমার বন্ধু বলে মনে করতাম। চলি।'

'চল, তোদের একটু এগিয়ে দিই।'

ওরা হাঁটতে শুরু করল। মন্দিরময় শহর কনখল থেকে হরিদ্বার। পেছন পেছন হরিপদ। খানিক যাওয়ার পর তনিমা বলল, 'এবার ফিরে যাও বাবা।'

হরিপদ মাথা নাড়ল, 'এমন কি বেশি, আর একটু যাই।'

আরও কিছুক্ষণ হাঁটা। তনিমা বল, 'এবার ফিরে যাও বাবা।'

হরিপদ পেছন ফিরে দেখে নিয়ে বলল, 'চল না, আর একটু যাই।'

ওরা যখন গঙ্গার ওপর বাঁধানো সেতু পার হচ্ছে তখন তনিমা বলল. 'বাবা ভোর হচ্ছে।'

হরিপদ বলল, 'হোক গে!'

২

আজও মাইনে হল না। দুপুর দুটো নাগাদ জানা গেল মালিক বোম্বে থেকে আজ আসতে পারবেন না। ম্যানেজারকে জানিয়েছেন আরও কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে। অফিসে এই নিয়ে গুঞ্জন উঠল। কেউ অবশ্য মুখ খুলে কিছু বলছে না। ছোট অফিস। সাকুল্যে আটজন লোক। ম্যানেজার ছাড়া। আটজনের মধ্যে চারজন কেরানি। আর কেরানিদের একজন শ্যামলেন্দু।

প্রতি মাসেই এই হচ্ছে। এক তারিখের বদলে তিন, বড় জোর পাঁচ। এ মাসে দশে এসে ঠেকেছে। এই বাজারেও তার মাইনে এগারশো বাহান্ন। সিক্সটি এইটের গ্রাজুয়েট, কোথাও চাকরি

জোটেনি। জুটবেও না কোথাও। চিৎকার করতে এটাও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সে যেমন সত্যিটা জানে, জানে অন্য সবাই। তবে এবার দেরি হবার কারণ আছে। মোটা টাকার চেক আটকে গিয়েছে বোম্বেতে। মালিক গিয়েছেন সেখানে তার ব্যবস্থা করতে। চেক পেলেই ক'মাস নিশ্চিন্ত। পুজোর আগে ভাল বোনাস পাওয়া যাবে।

খবরটা পাওয়ার পর আর কাজে মন এল না। শ্যামলেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। পকেটে মাত্র পাঁচ টাকা পড়ে আছে। এটা গতকালের পুরোন খাতাপত্তর বিক্রী করার টাকা। প্রতি মাসে ধার নিয়ে নিয়ে এমন অবস্থা যে একটি মানুষের মুখও মনে পড়ছে না যার কাছে নতুন করে চাওয়া যায়। ঝিম মেরে পড়ে রইল সে কিছুক্ষণ। এই সময় পাশের সিটের পালবাবু বললেন, 'দাদা, টাকা দশেক দিতে পারেন?'

বিবর্ণ চোখে তাকাল শ্যামলেন্দু। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল' 'নেই।'

অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতে প্রাইভেট বাসে আট আনা লাগে। ওয়েলিংটন থেকে শ্যামবাজার হেঁটে আসছিল সে। আট আনা বাঁচবে। আজকাল আট আনায় কি হয়! জীবনের ওপর ধিক্কার এসে গেল তার। এত বড় পৃথিবীতে সে স্ত্রী পুত্র নিয়ে মাত্র পাঁচ টাকার মালিক। লোকে নাকি হাজার হাজার রোজগার করে! কি করে? টাকা রোজগারের কোন উপায় তার জানা নেই। মুখ তুলে তাকাতেই হিন্দ সিনেমার হোর্ডিংগুলো চোখে পড়ল। রঙিন ছবি। নায়ক নায়িকার হাত ধরে ছুটছে। আঃ, ওদের টাকার চিন্তা নেই। কোথায় যেন পড়েছিল বোম্বের স্টার প্রতি ছবিতে তিরিশ লক্ষ টাকা দক্ষিণা পায়। ভাবা যায়? কিছুক্ষণ তাকাল শ্যামলেন্দু। সবে সন্ধে নেমেছে। পেট জ্বলছে খিদেয়। হঠাৎ কানে এল একটি কচি গলা, 'না, আমি যাব না, আমি বাড়ি যাব।'

শ্যামলেন্দু তাকাল। পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে যার পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম বেঁকে চুরে দাঁড়াচ্ছে। তার হাত ধরে টানছে হুমদো মত লোক, 'ঠিক হ্যায় খুকী, হামারা সাথ চলো, বহুৎ মেঠাই দেগা।'

'না—আমি যাব না, আমি বাড়ি যাব।

'অ্যাই চুপ। চিল্লাও মৎ।' লোকটা ধমকে উঠল।

শ্যামলেন্দুর মনে হল অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার নেই। নিজের ঘায়ে সে নিজে জ্বলছে। কিন্তু পা বাড়াবার আগে বাচ্চাটি ককিয়ে উঠল, 'আমি বাড়ি যাব।'

শ্যামলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বাড়ি কোথায় খুকী?'

খুকী মাথা নাড়াল, 'আমি জানি না।'

হঠাৎ দেখা গেল লোকটি মেয়েটির হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াচ্ছে। কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা দেখতে। তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। গতিক সুবিধের নয় বুঝে হুমদো মত লোকটি একটি চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

বাচ্চাটি কাঁদছিল। শ্যামলেন্দু মেয়েটির মাথায় হাত বোলালো, 'আহা কেঁদ না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কি নাম তোমার?'

'আমি বাড়িতে যাব।'

'কোথায় তোমার বাড়ি?'

'আমি জানি না। খান্না সিনেমার কাছে।'

'ও। আমি ওইদিকে যাব। কোন ভয় নেই, তুমি চল আমার সঙ্গে।'

পথচারীরা বলল, 'নিয়ে যান দাদা। নিশ্চয়ই এ কারো পাল্লায় পড়েছিল।'

'কিন্তু এই লোকটা যে ভাল তার প্রমাণ কি?'

'পুলিশের হাতে বাচ্চাটাকে হ্যাণ্ডওভার করে দিলে হয়?'

'আহা, চেহারা দেখলেই মনে হচ্ছে ছাপোষা মানুষ। নিয়ে যান।'

অতএব শ্যামলেন্দু মেয়েটিকে নিয়ে রওনা হল। একটুকু মেয়েকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। অতএব চেষ্টা করে ট্রামে উঠতে হল। পঞ্চাশ পয়সা বাঁচবে ভেবেছিল অথচ এখন আশি পয়সা বেরিয়ে গেল। মেয়েটির কান্না থামছিল না। ট্রামের লোকজন প্রশ্ন শুরু করতে শ্যামলেন্দু ঘটনাটা বলল। এতেও কারো কারো সন্দেহ যাচ্ছিল না।

হাতিবাগানে ট্রাম থেকে নামতে দুজন তাদের সঙ্গে চলল। খান্না সিনেমার সামনে গিয়ে মেয়েটা দিশেহারা। তার বাড়ি কোথায় বলতে পারছে না। রাত হচ্ছে। এগলি সেই গলির পর দেখা গেল সঙ্গী দুজন নিরুৎসাহ হয়ে সটকে পড়েছেন। মেয়েটা আর পারছে না। অনেক ভেবে চিন্তে শ্যামলেন্দু ওকে নিয়ে চলে এল বটতলা থানায়। ও সি ছিলেন না। থানায় জীবনে ঢোকেনি শ্যামলেন্দু। এস আইকে সব কথা বলতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তুললেন। মিনিট পনের বাদে ছুটে এলেন এক দম্পতি। মহিলা পাগলের মত বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরলো। ভদ্রলোকের মুখে হাসি, রুমালে কপাল মুছলেন। এস আই বললেন, 'সমস্ত কৃতিত্ব এই শ্যামলেন্দু বাবুর। উনি না থাকলে ওকে পাওয়া যেত না।'

সব ঘটনা জানার পর বাচ্চার মা বাবা তাকে কিছুতেই ছাড়লেন না। জোর করে নিয়ে গেলেন তাদের ফ্ল্যাটে। সুন্দর সাজানো বড়লোকের ফ্ল্যাট। শ্যামলেন্দু জানল বাচ্চা পড়ে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ছুটির পরে স্কুল বাসে বাড়ি ফেরে। আজ ফেরেনি। তারপরই এঁদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল। স্কুলে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন সমস্ত বাচ্চার সঙ্গে ও স্কুলের গেট দিয়ে বেরিয়েছিল বাসে উঠবে বলে। কিন্তু বাসে না উঠে সেই লোকটির খপ্পরে কি করে পড়ল তাই রহস্যময়। মেয়েটি এত ক্লান্ত যে কিছু খাইয়েই শুইয়ে দেওয়া হল তাকে। অতএব ঘটনাটা আপাতত জানা গেল না।

ওঁরা ওকে যত্ন করে চা প্যাস্ট্রি খাওয়ালেন। বারংবার কৃতজ্ঞতা

জানালেন। তারপর বেরুবার আগে ভদ্রলোক সবিনয়ে একটা খাম এগিয়ে দিলেন, 'একদম না বলবেন না। এটা আপনাকে রাখতেই হবে। আমার মেয়ের জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্যে দাম দিচ্ছি ভাববেন না। ওই দাম টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।'

শ্যামলেন্দু মাথা নাড়ল, 'ছি ছি ছি। একি বলছেন? একটা বাচ্চাকে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে টাকা নেব আমি? তা হয় না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি যথেষ্ট ভদ্রলোক। কিন্তু ওই দু হাজার টাকা না নিলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না।'

সঙ্গে সঙ্গে বুকের দরজায় আঘাত লাগল। দু-হাজার। তার তো মোটে চল্লিশ পয়সা খরচ হয়েছে। এ তার প্রায় দু মাসের মাইনের সমান। সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। পকেটে এখন চার টাকা কুড়ি পড়ে আছে। কিন্তু নিজের অজান্তেই সে মাথা নাড়ল, 'না, অসম্ভব। ওকে যত্নে রাখবেন। নজর দেবেন যেন এমন ঘটনা না ঘটে।'

দ্রুত পা চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল শ্যামলেন্দু। আকাশের নিচে আসা মাত্র শ্যামলেন্দুর খুব আনন্দ হল। পৃথিবীতে টাকাই সব নয়। মানবতা প্রেম ভালবাসা টাকা দিয়ে কেনা যায় না। নিজেকে খুব বড় মনে হতে লাগল।

বাড়িতে ঢোকার মুখে সে থমকে দাঁড়াল। খুব হইচই হচ্ছে। তিনটে ঘরেই আলো জ্বলছে। এ ব্যাপারে তার নিষেধ আছে। অযথা ইলেকট্রিক খরচ করা চলবে না। শ্যামলেন্দু দরজার কড়া নাড়াল। পৈতৃক বাড়ির একাংশ পেয়েছিল বলে সে এখনও বেঁচে আছে। নইলে ভাড়া না দেওয়ার অপরাধে তাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হত।

দরজা খুলল পুত্র। অকালকুষ্মাণ্ড। একগাল হেসে বলল, 'ও, তুমি এসে গেছ। মাসীরা এসেছে, রায়গঞ্জ থেকে। মা সন্ধে থেকে তোমার খোঁজ করছে।'

ভিতরে ঢুকল শ্যামলেন্দু। মাসীমা মানে তার একমাত্র

শ্যালিকা। বাল্যকালে সুন্দরী ছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর থেকে শ্যালিকার দিকে তাকালে পুলক জাগত। তারপর তার বিয়ে হল। প্রথম দিকে মাঝে মধ্যে দেখা হত আজকাল হয় না। বছর চারেক আগে ভায়রাভাই মারা যায়। তবু রায়গঞ্জে আছে এবং সেখানে ভায়রাভাই-এর কিছু জমিজমা থেকে আয় হয় বলে চলে যায় ওদের, এটুকুই জানে সে। ভায়রাভাই-এর মৃত্যুর পর পয়সার অভাবে যাওয়া হয়নি বলে স্ত্রীর কাছে প্রচুর গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল সেই সময়।

'ও জামাইবাবু, আপনি আমাদের একেবারে ভুলে গেলেন?' বলতে বলতে শ্যালিকা সামনে এসে দাঁড়াল। না, থানটান পরা নয়, শাঁখা সিঁদুর নেই এই যা।

'না, না, ভুলব কেন? কাজে কর্মে থাকি—, তা কখন আসা হল?' শ্যামলেন্দুর গলা থেকে যেন স্বর বের হচ্ছিল না। বাড়িতে কয়েকটা আলু পড়ে আছে সে জানে।

'এই তো বিকেলে। দিদি বলছিল সন্ধের পরেই চলে আসেন, এত রাত হল?'

শ্যামলেন্দু হাসল এর জবাবে। তার পর বলল, 'কি খবর সব?'

শ্যালিকা বলল, 'আর খবর! চার বছর আগে সেই যে কপাল পুড়েছে তার জের চলেছে এখনও। মেয়ে আর আমি, দুটি প্রাণী, যা ফসল হয় চলে যেত। কিন্তু দেবররা ঠকিয়ে নিচ্ছে সমানে। এক দেবর আছে, আমার চেয়ে বড়, বিয়ে করেনি, তাকে নিয়ে আমায় জড়িয়ে যতকেচ্ছা! আর পারি না। তার অপরাধ হল, আমাকে সাহায্য করা? যাক, আছি যখন কথা হবে। আপনার সাহায্য খুব দরকার।'

শ্যামলেন্দু রঙ ওঠা চেয়ারটায় বসল, 'তোমার দিদি কোথায়?'

'একটু আগে বের হল আপনার জন্যে অপেক্ষা করার পরে।'

'অ। তা সাহায্য মানে?'

দ্বিতীয় চেয়ারটায় বসল শ্যালিকা। ভারী শরীর। শব্দ হল। এই ঘরে ওই দুটো চেয়ার। একটা কেরাসিন কাঠের টেবিল। শ্যালিকা বলল, 'আমার আজকাল শরীর খারাপ হলে কিছুতেই সারতে চায় না। রায়গঞ্জের ডাক্তার বলছে অপারেশন করতে। কিন্তু আমি কলকাতার ভাল ডাক্তারকে দিয়ে দেখাতে চাই।'

'কিসের অপারেশন ?' কিছুই বুঝতে পারল না শ্যামলেন্দু।

শ্যালিকা মুখ ঘুরিয়ে দেখল ভেতরের দরজায় তার বোনপো দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠল, 'এই ছোঁড়া, দ্যাখ না তোর মা কোথায় গেল ?'

সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে বেরিয়ে যেতে দেখল শ্যামলেন্দু। শ্যালিকা গলা নামাল, 'মানে, মেয়েদের প্রতি মাসে যা হয় আমার তা হলে বন্ধ হচ্ছে না। আর সেই সঙ্গে কি যন্ত্রণা। কাটা ছাগলের মত ছটফট করি। বছর দুই ধরে হচ্ছে। কত হোমিওপ্যাথি কবিরাজী অ্যালোপাথি করেছি কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

বোধগম্য হল। সেই সঙ্গে সংকোচ। এককালে এই শ্যালিকার সঙ্গে কত ফষ্টি নষ্টি করেছে সে। রসিকতা করে বলেছে আমি জমি তৈরি করে দিচ্ছি আর ফসল ফলাবে আর একজন। সেই শ্যালিকা এখন অসংকোচে তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলছে। কিন্তু তার জানা শোনা কোন ডাক্তার নেই তো। কিছু ভেবে না পেয়ে সে বলল, 'ডাক্তার কি ভুল বলবে। অপারেশনটা ওখানে করিয়ে নিলেই পারতে।'

'অপারেশনের ঝামেলা কি জানেন ?'

'না।' দ্রুত মাথা নাড়াল শ্যামলেন্দু।

'শরীর থেকে মেয়েদের সব সম্পত্তি বাদ দেবে। তারপর মেজাজ হয়ে যাবে খিটখিটে। চুল পাকবে। মেয়েলি কিছু থাকবে না।' শ্যালিকা মুখ ঘোরাল।

'তা এই বয়সে ওসব আর রেখেই বা লাভ কি!' না বলে পারল না শ্যামলেন্দু।

'আহা, ঢঙ। আমার যেন সাধ আহ্লাদ বলে কিছু নেই।'

হতবাক শ্যামলেন্দু। বাংলাদেশের বিধবা মধ্যবয়স্কা মহিলার এ ব্যাপারে সাধ আহ্লাদ থাকা কি ঠিক? তাহলে সেই দেবরের ব্যাপারটাই তো সত্যি। এই সময় খোলা দরজায় স্ত্রী উদিত হল। হাতে বাজারের ব্যাগ, সেটা ভর্তি।

শ্যালিকা বলে উঠল, 'ওমা, তুই বাজারে গিয়েছিলি দিদি?'

'হুঁ। এত দেরি হল কেন?'

'আটকে গিয়েছিলাম।' স্ত্রীর হাতে ধরা ব্যাগের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হল সে।

অনেকদিন পরে চিংড়ি মাছের বাটিচচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেয়ে স্ত্রীর পাশে শুতেই ঘুম এসে গেল। কিন্তু তখনই কোমরে খোঁচা, 'মাইনে পাওনি?'

'না।'

'সেকি?'

'কি করব। মালিক বোম্বে গেছে।'

'ও ভগবান! আর পারি না। আমি কালকে শোধ দেব বলে পাশের বাড়ির রামতনুর কাছে কুড়িটা টাকা ধার করলাম যে।'

'এ্যাঁ, তুমি রামতনুর কাছে ধার করেছ? জানো না লোকটা চরিত্রহীন, লম্পট?'

'জেনে কি হবে? হঠাৎ করে বোন চলে এল মেয়ে নিয়ে। বাড়িতে তো আলু ছাড়া কিছু ছিল না। বাপের বাড়িতে বদনাম হোক আমি চাই না।'

'তোমার বাপের বাড়িতে আর আছেটা কে? খাল কেটে কুমির ঢোকানো।'

'মানে?'

'এবার রামতনু টাকা আদায়ের অছিলায় ঘনঘন আসবে।'

'তোমার চোখে কি ন্যাবা হয়েছে ? এই হাড়জিরজিরে শরীরটার দিকে কোন লম্পটের নজর পড়বে না।'

শ্যামলেন্দু শান্ত হল। কথাটা মিথ্যে নয়। স্ত্রীর চেহারা এখন যা হয়েছে তাতে পুরুষমানুষ থেকে কোন ভয় নেই। অথচ চট করে ওই ভয় মনে আসে।

'তোমার বোন কদিন থাকবে ?'

'জানি না। জিজ্ঞাসা করতে পারি না তো।'

'অপারেশনের কথা বলছিল।'

'থাকবে হয়তো কিছুদিন। আমি কি করে চালাবো বুঝতে পারছি না।' হঠাৎ কেঁদে উঠল স্ত্রী। শ্যামলেন্দু কিছু বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'কবে মাইনে হবে ?'

'জানি না।'

'তাহলে ?'

'ওর সঙ্গে টাকা পয়সা নেই ?'

'আমি সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারি ? তুমি পারবে ?

'আমাদের অবস্থা দেখে ওর নিজেরই উচিত খরচ করা।'

'তাতে আমাদের সম্মান বাড়বে ?'

'আর সম্মান ? সম্মান ধুয়ে কি জল খাবে ?' কথাটা বলেই তার মনে পড়ল সন্ধেবেলার সেই মেয়েটির বাবার কথা। তখন তিনি যা বলেছেন এখন তা বড় করে বাজছিল। অতগুলো টাকা! কোন মুখ্যু ছেড়ে দেয় ? সে দিয়েছে। কি গাধা সে! এখন কি করা যায় ?

পরদিন সকালে ধারের জন্য বেরিয়েছিল শ্যামলেন্দু। কোথাও সুবিধে হল না। আগের ধার শোধ না করলে কেউ হাত খুলবে না। সকালের রান্না কোনমতে চলে যাবে, রাত্রে কি হবে ? বাড়িতে

ফিরে সে আড়ষ্ট হল। বাইরের ঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা মারছে রামতনু। সামনে শ্যালিকা বসে, দরজায় স্ত্রী।

তাকে দেখে রামতনু বলল, 'এসো হে শ্যামলেন্দু, গিয়েছিলে কোথায়?'

'এই একটু।'

'জামাইবাবু, কি ভাগ্যিস উনি এসেছিলেন। খুব বড় হোমিও-প্যাথ ডাক্তারের সঙ্গে ও'র চেনাজানা আছে। তিনমাস আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে হয়।'

'তিনমাস!'

'না, না।' রামতনু বলল, 'সাতদিনে করিয়ে দিতে পারব। আজই বিকেলে চলুন, আলাপ করিয়ে নাম লিখিয়ে আসি।'

'খুব ভাল।' শ্যালিকা প্রফুল্ল, 'অপারেশন করাতে হবে না তো?'

'না, না। কত খারাপ কেস উনি ওষুধে সারিয়েছেন।'

'ও'র ফি কত?'

'আহা আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। রামতনু উঠল, 'ও শ্যামলেন্দু একটু বাইরে এস।'

শ্যামলেন্দু অবাক হয়ে অনুসরণ করল। বাইরে এসে রামতনু বলল 'মানুষের বিপদে আপদে যদি না দাঁড়াতে পারি তাহলে আর মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন? তোমার স্ত্রী কাল কিছু টাকা চেয়েছিল। কুড়িটা টাকা ছিল তখন পকেটে। এই নাও, একশটা টাকা রাখো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, সুবিধে হলে দিও।'

একশো টাকার নোট কী গরম মনে হল। রামতনু চলে গেলেও দাঁড়িয়ে রইল সে। দিন চারেক চলে যাবে এতে। তার মধ্যে অবশ্য মাইনে হবে।

কিন্তু মাইনে হল না। বোম্বে থেকে খবর এল মালিকের ফিরতে আরও দিন আটেক দেরি হবে। একেবারে দমবন্ধ অবস্থা। এদিকে

রোজ বিকেলে শ্যালিকা বের হচ্ছে রামতনুর সঙ্গে। রাত ৯টা দশটায় ফিরছে উড়তে উড়তে। ঘরে যে মেয়ে পড়ে আছে সেটাও মনে থাকছে না। মাঝে অবশ্য দুদিন তাকেও নিয়ে গিয়েছিল। নিষেধ ছিল বলে তার স্ত্রী-পুত্র যায়নি। আর প্রতিদিন বাইরে ডেকে নিয়ে যায় রামতনু। প্রথমে কিন্তু কিন্তু করত এখন করে না। স্পষ্ট বলে, 'তোমার আর্থিক অবস্থা তো জানি। শুনলাম অফিসে মাইনেও পাওনি। এটা রেখে দাও।'

আর একটি একশো টাকার নোট হাতে এল। অসাড় হয়ে নিল সে! রামতনু টাকাটা দিয়েই সরে গিয়েছিল। আট দিনে চারবার ঘটল ব্যাপারটা। কাউকে বলেনি সে। এমন কি স্ত্রীকেও নয়। কিন্তু শ্যালিকার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না সে। ডাক্তার দেখাতে গিয়ে যে বিদেশি গন্ধ মাখছে তার দিকে তাকানো যায় না। বিশেষ করে সে যে টাকাটা নিচ্ছে তা শ্যালিকার ভাবভঙ্গীতে বোঝা যাচ্ছে সে জানে!

শেষ পর্যন্ত মাইনে হল। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে রায়গঞ্জ ফিরে গেল শ্যালিকা। আর রামতনুর যাওয়া আসা বন্ধ হল। রাস্তায় দেখা হলেও টাকার কথা বলে না। কিন্তু মরমে মরে থাকে শ্যামলেন্দু। কাউকে বলা যাবে না। কত বড় একটা অন্যায়কে সে শুধু প্রশ্রয় দেয়নি তা থেকে উপার্জনও করেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই টাকা যদি রামতনুর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারত। কিন্তু মাইনের টাকায় তা সম্ভব নয়। এই সময় আবার শ্যালিকার চিঠি এল। ওষুধে কাজ হয়নি। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। কলকাতায় হাসপাতালে অপারেশন করাতে চায়। স্ত্রী বলল, রামতনুকে জানাতে। কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাধ্য হল শ্যামলেন্দু। খবর শুনে গম্ভীর হয়ে গেল রামতনু। বলল, 'কাছেই তো আর. জি. কর। চিঠি লিখে দিচ্ছি একজন ডাক্তারকে, গিয়ে করিয়ে নাও।

শ্যালিকা এল। বারংবার রামতনুর খবর করল। কিন্তু সে ব্যস্ত সময় পাচ্ছে না আসার। হাসপাতালে ভর্তি, অপারেশন ইত্যাদি হয়ে গেল। শ্যালিকা বাড়ি এল। তার যত্ন সেবা করতে পকেট খালি। অপরাধবোধ ভুলে গিয়ে শ্যামলেন্দু রামতনুর কাছে গেল। রামতনু স্পষ্ট বলল, 'আর সম্ভব নয়। অনেক দিয়েছি তোমাকে। আর কেউ না জানুক তুমি জানো। আর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।'

'ধারই দাও।'

'শোধ তো জীবনে করবে না। করতে পারবে না। দেব কেন?

'তখন তো দিতে।'

'তখন হোমিওপ্যাথি ছিল এখন অ্যালোপ্যাথি। বুঝতেই পারছ।'

বোঝেনি সে। কিন্তু সেই রাত্রে হঠাৎ শ্যালিকার কান্না। স্ত্রী তাকে সামলাতে পারছে না। কি কারণে কান্না জানার আগ্রহ ছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছিল না। অনেক ভেবে চিন্তে পরের দিন সে ওয়েলিংটনে স্কোয়ারে গেল। স্কুল ছুটির সময়। কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে নজর রাখল স্কুলের গেটের ওপর। কেউ যদি কোন বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যেতে চায় সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে তার বাবার কাছে টাকা নেবে। প্রথমবারের ভুল দ্বিতীয়-বারে করবে না।

ছুটি হল। মেয়েরা সবাই হয় স্কুল বাসে নয় গার্জেনের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। কোন অস্বস্তিকর দৃশ্য চোখে পড়ল না। হতাশ হল শ্যামলেন্দু। কিছু একটা ঘটতে পারে ভেবে আজ অফিস কামাই করেছে সে। হঠাৎ কানে এল, 'আপনি? এখানে?'

শ্যামলেন্দু ঢোঁক গিলল, 'ও ভাল?'

'হ্যাঁ। তারপর থেকে আমি নিজেই নিয়ে আসা যাওয়া করছি।'

'ও।'

'খুব পরিশ্রম হচ্ছে। অসুবিধেও। কিন্তু বাসের ওপর ভরসা করতে পারছি না।'

'কোন বিশ্বাসী লোক নেই?'

'না।' কাকে বিশ্বাস করব বলুন? এর জন্যে মাস গেলে আমি দুশো টাকাও দিতে রাজী আছি। আপনার কথা সবাইকে বলি আমরা। কি নির্লোভ মানুষ আপনি। আচ্ছা, চলি।' ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎ ডেকে উঠল শ্যামলেন্দু 'শুনুন'। ওরা দাঁড়াল।

শ্যামলেন্দু এগিয়ে গেল, 'আমি যদি বিশ্বাসী লোক দিই রাখবেন?'

'নিশ্চয়ই। আপনার লোক হলে আপত্তি নেই ব্যাটাছেলে রাখব না। মেয়েমানুষ চাই।'

'আমার স্ত্রী। অভাবের সংসার, উপকার হত। বেশী দূরে থাকি না আপনার বাড়ি থেকে। আপনারা এসে দেখে যেতে পারেন।'

'ঠিক আছে। আপনি ওঁকে নিয়ে সন্ধেবেলায় আসুন। ওর ক্লাস আটটায় শুরু হয়, ছুটি এখন। উনি পারলে অসুবিধে কি!' ওরা চলে গেল।

নাচতে লাগল মনে মনে শ্যামলেন্দু। সংসারে আরও দুশো টাকা আয় বাড়ল। প্রায় উড়েই চলে এল সে বাড়িতে। এসে দেখল শ্যালিকা ওই শরীরেই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তার দেবর এসেছে নিতে। আপত্তি করল না সে।

ওরা চলে গেলে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি হল।

শ্যামলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কাল রাত্রে কাঁদছিল কেন তোমার বোন।'

'তোমাকে শুনতে হবে না।'

'আহা বলই না।'

'তার মনে হচ্ছে সে আর মেয়েছেলে নেই। তাই।'

'ও। রামতনুও তাই এবার দূরে দূরে থেকেছে?'

'মানে!' চমকে উঠল স্ত্রী।

'কিছু না। শোন, তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি।' পুরো ঘটনাটা খুলে বলল সে। স্ত্রীর মুখে আলো, 'কিন্তু আমাকে ওরা কাজটা দেবে কেন?'

'আঃ, বললাম না, ওরা মেয়েদের চায়। তুমি তো তাই, তাই না?'

৩

কাল রাত্রেই সর্দি হয়েছিল, সেইসঙ্গে জ্বরো ভাব। মা তখনই একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছে। সকালে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। বাবা এবং মা আর তামা এ-সময় যন্ত্রের মতো দ্রুত তৈরি হয়। বাবা এবং মায়ের অফিস, আর তামার স্কুল। বাড়িতে তিনটে টয়লেট আছে। অসুবিধে হয় না। আজ ঘুম ভাঙামাত্র মা বলেছিলেন, 'নাঃ, জ্বর নেই। তবে আজ স্কুলে যেও না। আমি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ রেডি করে রেখে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে খেয়ে নিও। মাঝে-মাঝে ফোন করব।'

ও'রা দু'জন একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত যান। সেখানে পার্কিং-এ গাড়ি রেখে টিউব ধরেন। বাবার দুটো স্টেশন আগে মা নেমে যান। দু'জনের আলাদা এলাকায় অফিস। ফেরার সময় মা আগে আসেন। বাড়িতে গাড়ি নিয়ে এসে আবার ঘণ্টা-দুয়েক বাদে ফিরে যান বাবাকে টিউব স্টেশন থেকে তুলে আনতে। ঠিক আটটায় তামার স্কুল-বাস আসে দরজায়। সে যখন যায় এবং স্কুল থেকে ফেরে, তখন বাড়িটা তালাবন্ধ থাকে।

তামার বয়স পনেরো। গায়ের রং উজ্জ্বল, মুখ-চোখ ভাল। সে মুখ ধুয়ে কিচেনে এল। মাইক্রোওয়েভের দিকে তাকাল। এখন কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তবু একটু গরম পানীয় বানিয়ে নিল। ওদের এই কিচেনে হরেকরকম খাবার সবসময় মজুত থাকে। ইন্ডিয়ায় গেলে এই কিচেনটার কথা খুব মনে পড়ে। ওখানে ঠাম্মা নানারকম খাবার তৈরি করে দেন বটে, কিন্তু সেগুলো চাইলেই পাওয়া যায় না। তৈরি করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

লিভিং রুমে এসে রিমোট টিপে টিভি খুলল তামা। একটা ক্রাইম ছবি হচ্ছে চ্যানেল সেভেনে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারে গুলি ছুঁড়ল অপরাধী। লোকটা পড়ে গেল। অপরাধী পালাল। পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স এল। দেখা গেল লোকটা মরে গেছে। পুলিশ অফিসার বললেন, 'ওর মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ও জানত এই এলাকায় কারা ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা করে।'

রিমোট টিপে টিভি বন্ধ করল তামা। এটা নিশ্চয়ই অ্যান্টি ড্রাগ বিজ্ঞাপন। এতে কোনও রহস্য নেই। এখন চারপাশে ড্রাগের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেন। তাদের স্কুলে ঢোকার রাস্তায় বোর্ডে লেখা আছে 'ড্রাগ ফ্রি জোন'। স্কুলের গেটেও 'সাইনবোর্ড টাঙানো' 'ড্রাগ ফ্রি স্কুল'। কিন্তু অনেকেই ড্রাগ খায়। লুকিয়ে-চুরিয়ে। যেদিন খায় সেদিন স্কুলে আসে না। মার্থার বাড়িতে জড়ো হয়। চারজনকে জানে সে। ক্যাথারিন তাকে দলে টানতে চেয়েছিল বলেই জানে। ক্যাথরিন তার অনেকদিনের বন্ধু। বলেছিল, 'যেই তুই কিকটা পাবি অমনই মনে হবে পৃথিবীটা কী সুন্দর। কোথাও কোনও প্রব্লেম নেই।'

তামা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই রোজ খাস?'

'নো। সপ্তাহে একদিন। রোজ খেলে নেশা হয়ে যাবে।

তখন না পেলে শরীর রিভোল্ট করবে। শরীরের ভেতরটা অকেজো হয়ে যাবে। 'রোজ কেউ খায় পাগল।'

'খাওয়ার কী দরকার?'

'ওহ্ নো! ইট্স এক্সাইটিং। তুই খুব ভিতু। আঠারো না হলে অ্যাডাল্ট হবি না।'

এটা ওকে খোঁচা দেওয়ার জন্য। বাবা তাকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছেন, কিন্তু রাস্তায় বের করতে দেন না। আঠারোর নীচে লাইসেন্স পাওয়া যায় না। ধরলে কড়া শাস্তি। ক্যাথরিন কিন্তু প্রায়ই চালায়। ওর বয়সের তুলনায় শরীরটা বড়। লাইসেন্সের তোয়াক্কা করে না ও। এখনও অবশ্য ধরা পড়েনি। তামাদের ক্লাসে ক্যাথরিন আর তামার রেজাল্ট সবচেয়ে ভাল।

ক্যাথরিন ড্রাগ নিতে শিখেছিল মার্থার কাছে। মার্থা শিখেছে ওর দাদার বন্ধুর কাছে।

ড্রাগ খাওয়া ছেলেমেয়েদের যেসব ছবি ছাপা হয়, তার সঙ্গে ওদের কোনও মিলন নেই। স্কুলে কড়া সার্কুলারে দেওয়া আছে, কোনও ছেলেমেয়ে যদি ড্রাগ খাচ্ছে প্রমাণিত হয়, তা হলে তাকে সঙ্গে-সঙ্গে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। যারা ড্রাগ বিক্রি করে তারা অন্য স্কুলের আশপাশে পার্কে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু ড্রাগ ফ্রি জোনের নোটিস থাকায় ওদের স্কুলের দিকে কেউ বিক্রি করতে আসে না। স্কুলের পাহারাদাররা ওদের ছাড়বে না। তামা ক্যাথরিনকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা কোথায় ওসব কেনে? ক্যাথি বলতে চায়নি। কিন্তু একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ডিমফিল্ডের মার্কেট প্লেসে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু কালো মানুষকে দেখিয়ে বলেছিল, এদের কাছে চাইলেও পাওয়া যায়।

বাড়িতেও এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের দেওয়ালে যেসব মানুষ সারাদিন সারাসন্ধ্যা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রায়ই পুলিশ ধরে ড্রাগ ব্যবসায় সাহায্য

করার অভিযোগে। ওয়াসিনটন ব্রিজ টানেলেও ওদের দেখতে পাওয়া যায়। মা-বাবার সঙ্গে ওই পথে গিয়ে লোকগুলোকে দেখছে তামা। দেখলেই ভয় লাগে। বাবা বলেন, 'শুধু কালোরা নয়, সাদারাও আছে সমান-সমান। পানামা দখল করে নুরিয়েগাকে যখন ভাটিকান এম্ব্যাসির ভেতর আটকে রাখা হয়েছিল তখন বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই লোকটা পৃথিবীর অন্যতম ড্রাগ-কারবারি। একটা ক্যাসেট বেরিয়েছিল তখন নুরিয়েগাকে গালাগালি দিয়ে। স্কুলের মেয়েরা তা গাইত। এমনকী ক্যাথিও। অথচ ক্যাথি সপ্তাহে একদিন ড্রাগ খায়। মা ক্যাথিকে চেনে। মাকেও কথাটা বলতে পারেনি সে। আগে যা জানত তাই মাকে বলত। এখন বড় হওয়ার পর সে বুঝে নিয়েছে কোনটা বলা দরকার। মা ক্যাথির ওপর রাগ করবেন। হয়তো স্কুলে ফোন করে বলে দেবেন। স্কুল যদি ক্যাথির শরীর টেস্ট করে তা হলে সত্যিটা প্রকাশ পাবেই। তা হলেই ওরা ওকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। অতদিনের একটা ভাল বন্ধুকে হারাবে তামা। তাই বলেনি কিছু। ক্যাথি প্রতি সপ্তাহে ওজন নেয়। ওর ওজন কমার বদলে একটু বেড়েছে। ড্রাগ যদি ক্ষতি করত তা হলে ওজন কমত।

টেলিফোন বাজল। এ-বাড়ির প্রতি ঘরে টেলিফোন। কিচেনেও। রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই দূর থেকে গলা ভেসে এল, 'হেলো! তামা নাকি? আমি বড়মামা!'

খুশি হল তামা, 'হাই! তুমি কেমন আছ?'

'ভাল না। মা-বাবা কোথায়?'

'অফিসে। আমার শরীর খারাপ বলে স্কুলে যাইনি।'

'রাত্রে লাইন পাইনি। আমি খুব প্রব্লেমে পড়েছি অন্তুকে নিয়ে। মাকে বলবি ফোন করতে।'

'কী প্রব্লেম?' জিজ্ঞেস করা মাত্র লাইনটা কেটে গেল।

বড়মামা ফোন করেছিলেন ইন্ডিয়া থেকে। খুব মজার মানুষ। গত বছর তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। অন্তু বড়মামার ছেলে। চার বছর আগে সে যখন ইন্ডিয়ায় গিয়েছিল তখন অন্তুকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। আমেরিকা সম্পর্কে খুব আগ্রহ অন্তুর। তামার থেকে দু' বছরের বড়।

ইন্ডিয়ার আত্মীয়দের ভাল লাগে তামার. কিন্তু সেখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। এত ভিড়, এত গরম যে. হাঁপিয়ে ওঠে। ওখানে যাঁরা জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন তাঁদের শরীর নিশ্চয়ই জল, খাবার, আবহাওয়ার সঙ্গে একটু-একটু করে মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তামা পারে না। রাস্তায় ট্রাফিক রুল বলতে কিছু নেই। খাবারদাবার ফ্রেশ না নিয়ে এলে ভাল পাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে মনে হত সবাইকে যদি এদেশে সে নিয়ে আসতে পারত, কী মজা হত! বাবা মা ইন্ডিয়ায় গিয়ে প্রথম ক'দিন খুব উৎসাহে থাকেন। একটু পুরানো হওয়ামাত্র কেমন ঝিমিয়ে পড়েন।

অন্তুর কী হয়েছে? এমন কী সমস্যা যার জন্য বড়মামাকে অতদূর থেকে ফোন করতে হল! ভেবে পাচ্ছিল না তামা। সে এখন ইন্ডিয়ায় টেলিফোন করতে পারে। কিন্তু লং ডিসট্যান্স কল করলে বাবা রাগ করবেন। সে মাকে ফোন করে বড়মামার ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। তার শরীর এখন ভাল আছে. একটু বাদেই ব্রেকফাস্ট খাবে। মা যেন চিন্তা না করেন।

টিভি দেখতে ইচ্ছে করছে না। সারাটা দিন বাড়িতে একা বসে থাকা, কী বিরক্তিকর ব্যাপার। স্কুলের বাস এসে দাঁড়াল রাস্তায়। জানালা দিয়ে দেখল সে। দু' মিনিট দাঁড়াবে বাসটা। না গেলে চলে যাবে। ক্যাথরিন যে জানালায় বসে সেখানে আজ কেউ নেই। ওই সিটটা ক্যাথির পাকা। তবে কি আজ ক্যাথিও স্কুলে যাচ্ছে না। বাস বেরিয়ে গেল।

ক্যাথরিনের বাড়িতে ফোন করল সে। ক্যাথিই ধরল, 'ও,

তুই। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

'ভয়? কেন?'

'কিছু না। তুই স্কুলে যাসনি?'

'না। শরীর ভাল না। তুই যাসনি কেন?'

'এমনই।' একটু চুপ করল ক্যাথি, তামা, তুই আমাকে সাহায্য করবি?'

'নিশ্চয়ই। কী ব্যাপারে বল?'

'আমি তোর কাছে যাচ্ছি।' লাইন কেটে দিল ক্যাথি।

মিনিট পনেরো বাদে ক্যাথি গাড়ি নিয়ে এল। ওর মায়ের গাড়ি এটা। মা গতকাল নিউ অরলিন্সে গিয়েছেন তাঁর বাবাকে দেখতে। দরজা খুলতেই সোফায় ধপ করে বসে পড়ল ক্যাথি। ওকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। অথচ গতকালও স্বাভাবিক ছিল।

ক্যাথি বলল, 'মার্থা আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে।'

'কী বিপদ?'

'কাল রাত্রে আমাকে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে ব্রাউন সুগারের। আজ সকাল পর্যন্ত রাখতে বলেছিল। আমি আপত্তি করেছিলাম, শোনেনি।' ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করল ক্যাথি।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তামার। একটা অ্যালার্ম ক্লকের বাক্সের সাইজের প্যাকেট। ব্রাউন সুগার কী জিনিস তা কোনওদিন দেখেনি সে। ক্যাথি বলল, 'মার্থা বলেছে এতে নাকি পঞ্চাশ হাজার ডলারের জিনিস আছে। সাধারণ ব্রাউন সুগার নয়।'

'মার্থাকে ফেরত দিয়ে দে।' কোনওমতে বলতে পারল তামা।

'আজ সকালে ওকে ফোন করেছিলাম।'

'কী বলল?'

'ও নেই।'

'নেই মানে? কোথায় গেছে?'

'ওকে কাল রাত্রে কেউ খুন করেছে।'

'সে কী!'

'টিভিতে দেখিসনি? আজ সকাল থেকেই দেখাচ্ছে।' ঘড়ি দেখল ক্যাথি।

'না তো।' বলে তামা টিভির সমনে ছুটল। লোকাল নিউজের সময় এখন। ক্যাথিও ওর পেছনে এল। চ্যানেল অন করে কিছু বিজ্ঞাপন দেখল। তারপর খবর আরম্ভ হল। প্রথমেই, 'স্কুল গার্ল মার্ডারিড।' হেডলাইন বলে আবার মার্থার খবরে ফিরে এল। মার্থা গতকাল রাত্রে বাড়িতে ফিরছিল। ওদের বাড়ির সামনে আততায়ী দাঁড়িয়ে ছিল। তখন আশপাশে কেউ ছিল না। শধু উলটো দিকের একটা বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখছেন লোকটা মার্থার সঙ্গে কথা বলল। শেষে ঝগড়া করল। দূরত্বের জন্য বিষয়বস্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না। লোকটা মার্থাকে হাত তুলে শাসাল। মার্থা সেটা উপেক্ষা করে চলে যেতে লোকটা পেছন থেকে গুলি চালায়। বৃদ্ধা রিভলভার দেখেছেন। সাইলেন্সার লাগানো ছিল বলে শব্দ হয়নি। শুধু মার্থার শরীর উলটে পড়ে যায়। বৃদ্ধ এমন হকচকিয়ে গিয়েছিল যে, চিৎকার করতে তাঁর সময় লেগেছিল। তবে তিনি দেখেছিলেন আততায়ী মার্থা পড়ে যাওয়ার পর তার পোশাকে কিছু সন্ধান করেছিল। সে যে পায়নি এটা তিনি নিশ্চিত। পথের পাশে একটা বাইক দাঁড় করানো ছিল। আততায়ী সেটা চেপে চলে যায়। বৃদ্ধাই পুলিশকে ফোনে জানান। ইতিমধ্যে পুলিশ মার্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে যা জানতে পেরেছে তাতে সন্দেহ হচ্ছে সে ড্রাগ--ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। প্রতি সপ্তাহে কিছু মেয়ে দুপুরে ওর বাড়িতে মিলিত হত। এই মেয়েরা কারা তা এখনও জানা যায়নি। জোর তদন্ত চলছে।

এই খবরের সঙ্গে মার্থার সঙ্গে বাড়ির বাইরেটা, তার শোবার ঘর মৃত এবং জীবিত মার্থার ছবি বারংবার দেখানো হচ্ছিল। ওরা

দমবন্ধ করে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিল। মার্থার পড়ার টেবিল যখন দেখাচ্ছে তখন ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠল, 'হা ভগবান!'

তামা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'আমার বই। আমার নাম লেখা আছে ওতে। মার্থা পড়তে নিয়েছিল।' মুখে হাত দিল সে, 'কি হবে এখন?'

তামা ওর কাঁধে হাত রাখল, 'তাতে কী হয়েছে। বন্ধু তো বই নিতেই পারে।'

'কিন্তু আমিও তো দুপুরে ওর বাড়িতে যেতাম।'

ওরা দুজন চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ক্যাথি উঠল, 'আমি যাচ্ছি। তুই ওই প্যাকেটটা কিছুদিন তোর কাছে রেখে দিবি?'

'আমার কাছে রাখতে চাইছিস কেন?'

'যে মার্থাকে খুন করেছে সে আমার কাছে আসতে পারে। পুলিশ তো আসবেই। আর এসে যদি ওটা দ্যাখে তা হলে—" ক্যাথি মাথা নাড়ল।

'এটাকে রাখার কী দরকার? ফেলে দে জলে।'

'না!' দৃঢ় গলায় উচ্চারণ করল ক্যাথি।

'কেন?'

'সহজে পাওয়া যাবে না ওই জিনিস।'

'পাওয়ার কী দরকার?'

'তুই বুঝবি না।'

'তোর নেশা হয়ে গেছে ক্যাথি।'

'হলে হোক, তোর কী?'

'তা হলে আমি এটা রাখতে পারব না। আর রাখলে মাকে বলব।'

'তামা তুই আমার উপকার করবি না?' কাতর গলা হয়ে গেল ক্যাথির।

'ওই প্যাকেট আমি রাখতে পারব না। ক্যাথি, তুই এটাকে ফেলে দে।'

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ক্যাথলিন। ফুঁপিয়ে কাঁদল কিছুক্ষণ তারপর বলল, 'আমি মরে যাব তামা। ওরা যেমন মার্থাকে মেরে ফেলেছে। তেমনই আমাকেও মারবে।'

'কারা মার্থাকে মেরেছে ?'

'আমি জানি না। তবে মার্থা আমাকে বলেছিল ওরা খুব দামি জিনিস দেবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার দাম। টাকাটা জোগার করতেই হবে। আমার কাছে চেয়েছিল। আমি দেব কী করে ? আমার পাঁচশো ডলার আছে। মার্থা পাচ হাজার জোগাড় করেছিল। তাই দিতে চেয়েছিল লোকগুলোকে। ওরা রাজি হয়নি।'

'ওরা তো তোকে চেনে না।'

'কী জানি! আমার খুব ভয় করছে। যদি মার্থা আমার নাম ওদের কাছে করে থাকে!' ভেঙে পড়ছিল ক্যাথি!

'তুই পুলিশকে সব খুলে বল।'

'না। তা হলে আমার ছবি টিভিতে সবাই দেখবে। ওরাও জানতে পারবে। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। নেশা হোক বা না হোক একদিন তো সপ্তাহে খাই।'

'তা হলে তুই ওটা জলে ফেলে দে।'

'আমি একা আর ওটা নিয়ে যেতে পারব না তামা।'

বন্ধুর কান্না, চেহারা দেখে একটু ভাবল তামা। তারপর এগিয়ে গিয়ে মাকে টেলিফোন করল, 'মা' ক্যাথি এসেছে ওর সঙ্গে একটু বের হব ? না, না, জ্বর নেই। বেশি দূরে না, কে মার্টের দিকে। অ্যাঁ, না, ও স্কুলে যায়নি। কেন ? এমনই। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব। প্রমিস।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

দরজা বন্ধ করে তামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ক্যাথির সঙ্গে। একটু শীত-শীত করছিল। যদিও এখন শীত নেই। জিনিসের

ওপর সুতোর পুলওভার পরেছে সে। দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল। ক্যাথি গাড়িতে উঠে বসতেই তামা বলল, 'তোর ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। যদি পুলিশ ধরে তা হলে কিন্তু প্যাকেটটা লুকনো যাবে না।"

'যাঃ। কোনওদিন ধরেনি, আজও ধরবে না।'

'না। চল হেঁটে যাই।'

ক্যাথি বিরক্ত হল। এখানে একমাত্র জগিং কিংবা মর্নিং ওয়াকের সময় লোকে ফুটপাত দিয়ে হাঁটে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িটা নির্জন গাছগাছালিঘেরা এলাকায় বলে পথে মানুষ দেখা যায় না। পুলিসের ভয়েই ক্যাথি গাড়ি থেকে নামল। ওর ব্যাগেই প্যাকেটটা রয়েছে।

দুই বন্ধুতে পাশাপাশি অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে গেল। ক্যাথি অবশ্য মাঝে-মাঝেই মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে তাকাচ্ছিল। বাঁক ঘুরতেই ওরা লোকটাকে দেখতে পেল। রাস্তার এপাশে লেক, অন্যদিকে কে মার্ট। কে মার্টের সামনে পার্কিং লটে এখন বেশি গাড়ি নেই। তবু কিছু মানুষকে সেখানে দেখা যাচ্ছে। আমেরিকার প্রায় সব বড় শহরে এই কম্পানির বিশাল ডিপার্টমেন্টাল দোকান রয়েছে। নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত মানুষের যা-যা প্রয়োজন তা একটা ফুটবল মাঠের আয়তনের ওই দোকানটায় রয়েছে। কে মার্টের উলটোদিকে হাঁটতে লাগল ওরা। লেকেটার গায়ে একটা ফেন্সিং আছে। একটিও মানুষ লেকের ধারেকাছে নেই। ওরা ফেন্সিং-এর কাছে চলে এল। তামা বলল, 'কেউ নেই। এখান থেকে প্যাকেটটা জলে ছুঁড়ে দে।'

ক্যাথি বলল, 'প্যাক না খুলে ছুঁড়ে দিলে এটা ঠিক থাকবে। ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে মোড়া। প্যাকেটটা ছিঁড়ব ?'

কোনওদিন ব্রাউন সুগার দেখেনি তামা। প্যাক খুললে নিশ্চই দেখা যাবে। সে মাথা নাড়তেই পেছন থেকে গলা ভেসে

এল. 'এই যে খুকিরা, ওখানে কী করছ ?'

চমকে পেছনে তাকাতেই ওদের দম বন্ধ হয়ে গেল। একটা পুলিশের গাড়ি কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। ড্রাইভিং সিটে বসে একজন অফিসার ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্যাথি কাঁধ নাচাল, 'লেক দেখছি। লেক দেখাটা কি অন্যায় ?'

'মোটেই না। তোমরা কি কারও জন্য অপেক্ষা করছ।'

'না।' তামা মাথা নাড়ল।

'ওকে, ওকে। দেন পুশ অফ্। কাল ওই পাড়ায় একটি তোমাদের বয়সী মেয়ে খুন হয়েছে। মেয়েটা ড্রাগ খেত। এরকম একটা ঘটনা আর ঘটুক আমরা চাই না।'

তামা প্রতিবাদ করল 'আমি ড্রাগ খাই না।'

'ইট্‌স গুড। কিন্তু খুকি, এই লেকে দেখার কিছু নেই।'

অতএব সরে আসতে হল। ওরা যতক্ষণ না রাস্তা পেরিয়ে কে মার্টের দিকে এগিয়ে গেল ততক্ষণ অফিসার নড়লেন না। গাড়িটা বেরিয়ে গেলে স্বস্তি পেল ওরা। তামা বলল, 'ভাগ্যিস তুই তোর গাড়িটা ওখানে পার্ক করিসনি।'

ক্যাথি বলল, 'লোকটা মার্ডার কথা বলল। আমাকে সার্চ করলেই...'

'কী করবি এখন প্যাকেটটা নিয়ে ?'

'কী করি!' পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ক্যাথি বিড়বিড় করল। তামা ঘড়ি দেখল। ইতিমধ্যে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে গেছে। মা ঠিক এক ঘণ্টা পরে ফোন করবেন। সে প্রমিস করেছে ওই সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে।

ক্যাথি বলল, 'চল, কে মার্টের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বক্সে ওটা ফেলে দিই।'

'যে লোকটা খুলবে সে যদি ড্রাগ খায় তা হলে ফেরত দেবে ?'

'না দিলে না দেবে, আমাদের কী!'

'বাঃ, তাতে লোকটার সর্বনাশ হবে। ওর বাড়ির লোকজনের ক্ষতি হবে।' বলতে-বলতে তামা দেখল একটা লোক কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা ভাল লাগল না। এই সময় ক্যাথি বলল, 'মাটিতে পুঁতে ফেললে কীরকম হয়?'

'কোথায় পুঁতবি?'

'আমাদের বাড়িতে তো মাটি নেই। তোদের বাড়ির পেছনের বাগানে যদি পুঁতে দিই? সেই ভাল। কেউ দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না।"

সায় দিচ্ছিল না মন। বাবা-মা জানবেন না যে বাড়ির বাগানে অত হাজার ডলারের ব্রাউন সুগার আছে। পুলিশ যদি আসে, যদি সঙ্গে কুকুর থাকে তা হলে খুঁজে পেতে দেরি হবে না। সেক্ষেত্রে ওরা বাবা-মাকেও ধরবে। সে মাথা নাড়ল, 'না, আমাদের বাড়িতে না। বরং চার্চের পেছনে যে বাগানটা, সেখানে কেউ যায় না। আজ চার্চ ডে নয়। সেখানেই পুঁতে দেওয়া যেতে পারে।"

তামা হিন্দু। কারণ তার বাবা-মা তাই। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে সে কয়েকবার চার্চে বেড়াতে গিয়েছে। ওই বাগানটাকে তার খুব ভাল লাগে। এদিকে লোকটা এখনও তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তামা ওকে এড়াতেই ক্যাথিকে নিয়ে কে মার্টের ভেতরে ঢুকল। লোকজন এই অসময়ে তেমন নেই। কর্মচারীরা ছড়িয়ে আছে আশপাশে। এককোণে টিভি চলছে। সবাই সেদিকে তাকিয়ে। তামারা দেখল মার্থার খবরটাই বলা হচ্ছে।

পুলিশ জানতে পেরেছে গত রাত্রে মার্থা তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে সে বন্ধুর কাছে একটা প্যাকেট রেখে এসেছে। মার্থা যে ড্রাগ-চোরাচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল এটা তার প্রমাণ। এই অবধি শুনেই ক্যাথি তামার হাত আঁকড়ে ধরল। সংবাদপাঠিকা তখনও বলে যাচ্ছেন, "পুলিশ একটু আগে মেয়েটিকে গ্রেফতার করে। মেয়েটির নাম লুসি। ওরা একই ক্লাসে পড়ত।

লুসির কাছে যে প্যাকেটটা পাওয়া যায় তাতে সাধারণ চিনির দানা ছিল। লুসি বলেছে মার্থা তাকে রাখতে দিয়েছিল এক রাত্রের জন্য। কী ছিল সে খুলে দেখেনি। এদিকে মার্থার মা জানিয়েছেন তাঁর মেয়ে পাঁচ হাজার ডলারের একটা ক্যাশ সার্টিফিকেট তাঁদের অজান্তে ভাঙিয়েছে। কিন্তু মার্থা কেন লুসির কাছে সাধারণ চিনি রাখতে যাবে তা বোধগম্য হচ্ছে না। পুলিশ সন্দেহ করছে চোরাকারবারিরা মার্থাকে ভুল বুঝিয়েছিল।"

ক্যাথি তামার দিকে তাকাল। হঠাৎ তামা উত্তেজিত হয়ে ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এল, "আমি মাকে ফোন করছি।"

'সে কী! কেন?'

'মা এলে সব কথা খুলে বলব।'

'অসম্ভব।' মাথা নাড়ল ক্যাথি।

'তোর প্যাকেটেও লুসির মতো চিনি পাওয়া যেতে পারে।'

'কী করে বলব?'

'মা এসে প্যাকেটটা খুললেই বোঝা যাবে।' বলতে-বলতে তামা দেখল সেই লোকটা কে মার্টের ভেতরে ঢুকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। চোখাচোখি হতেই লোকটা এগিয়ে এল, 'এক্সকিউজ মি বেবি, তোমার নাম কি ক্যাথলিন?'

'কেন? নামে কী দরকার?'

'আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম তুমি তামার বাড়িতে এসেছ। তামার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম কেউ নেই কিন্তু তোমাদের গাড়িটা ওখানে রয়েছে। তারপরেই রিপোর্ট পেলাম তোমাদের বয়সী দুটো মেয়েকে লেকের ধারে দেখা গেছে।'

'আপনি কে?' ক্যাথি জিজ্ঞেস করল কাঁপা গলায়।

লোকটা পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, 'ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর জন স্মিথ।' জন হাসল, 'তুমি খুব নার্ভাস হয়ে আছ মনে হচ্ছে।'

"না, নার্ভাস কেন ?" ক্যাথি মুখ ফেরাল।

"ওয়েল। আমরা তামার বাড়িতে বসতে পারি। ওর মা-বাবাও এখনই এসে পড়বেন। তা ছাড়া তোমাদের গাড়িটা ওখানে পড়ে আছে। সেটা নিতে তোমার মা ওখানে আসছেন।" জন হাত তুলল, "চলো, ওইখানে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

ক্যাথি কাতর চোখে তামার দিকে তাকাল। জন এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। ক্যাথি ফিসফিস করে বলল, "ব্যাগ থেকে বের করে ফেলে দেব ?"

"দেখতে পাবে।" তামা জবাব দিল।

"কিন্তু আমার ব্যাগ থেকে ওটা পেলে জেল হবে, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

ডিটেকটিভ জন চেঁচিয়ে ডাকতেই ওরা এগিয়ে যেতে বাধ্য হল। গাড়িতে পথটা ফুরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্তেই। তামা দেখল বাড়ির বারান্দায় মা দাঁড়িয়ে আছেন চিন্তিত মুখে। ক্যাথির মা গাড়ির কাছে। বাবাকে দেখতে পেল না। গাড়ি থেকে নামতেই তামার মা দৌড়ে নেমে এলেন। হাত তুলল জন, "না, না, উত্তেজিত হবেন না। চলুন ভেতরে গিয়ে কথা বলি।"

তামার মা তামার হাত ধরেছিলেন। ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তার মা। ক্যাথি কাঁদছিল। ভেতরে ঢুকে সবাইকে সোফায় বসতে বললেন জন। তারপর শুরু করলেন, "আমি একটু খুলেই বলি। লুসি, মার্থার বন্ধু স্বীকার করেছে ওরা সপ্তাহে একদিন মার্থার বাড়িতে মজা করতে যেত। ওরা ড্রাগ খুব সামান্যই নিত, তাই নেশা হয়নি। ক্যাথি, কী বল ?"

ক্যাথি নীরবে মাথা নাড়তেই জন খুশি হলেন, দ্যাটস গুড। চতুর্থ মেয়েটির নাম লিজা। সে-ও এরই মধ্যে কথাটা স্বীকার করেছে। মার্থা কাল রাত্রে লিজার বাড়িতেও গিয়েছিল। লিজা এবং ক্যাথির নাম আমরা জানতে পারি লুসির কাছ থেকে। মার্থা

তার তিন বন্ধুকে তিনটে প্যাকেট দিয়ে এসেছিল। ক্যাথি, তোমার প্যাকেটটা দাও।"

ক্যাথি চুপ করে বসে রইল। তার মা বললেন, "ক্যাথি, উনি যা বলছেন তাই করো।"

ক্যাথি তখন ব্যাগ খুলে প্যাকেটটা টেবিলে রাখল। সেটা তুলে নিয়ে চটপট খুলে ফেললেন জন। সেলোফেন কাগজের প্যাকেটের ভেতরে লালচে-সাদায় দ্রব্যদানা চোখে পড়ল সবার। সেই মোড়কটা খুলে একটা দানা জিভে নিয়ে চোখ বন্ধ করলেন জন। তারপর হেসে ফেলে দিলেন টেবিলে, "হ্যাঁ, এটাও চিনির দানা।" সঙ্গে-সঙ্গে তামা এবং ক্যাথির মায়ের স্বস্তির নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। জন বললেন, "মার্থা জানত না এই তিনটে প্যাকেটে চিনির দানা আছে। পাঁচ হাজার ডলার দিয়ে সে পঁচিশ সেণ্টের চিনি কিনেছিল। ওকে কেউ ধাপ্পা দিয়েছে। ওকে যেমন ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে তেমনই আর-একজন ধাপ্পা খেয়েছে। যে মার্থাকে বিক্রি করেছে সে আর-এক নেশাখোরকে খবর দিয়েছিল মার্থার কাছে জিনিসটা আছে। লোকটা মার্থার কাছে সেটা চায়। মার্থা ভয়ে লুসির নাম করে। কিন্তু সে বিশ্বাস করে না। ঝগড়া হয় এবং গুলি করে। ড্রাগের জন্য ওরা সব করতে পারে। লোকটা এর পরে লুসির বাড়িতে যায়। রাত হয়ে যাওয়ায় ভেতরে ঢুকতে পারে না। অপেক্ষা করে সুযোগের জন্য। কিন্তু সেই সময় তার নেশা প্রবল হয়ে ওঠে। ওই সময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না ওরা। বাড়ির পাশের গাছ বেয়ে দোতলায় উঠতে যায় সে। শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পড়ে যায়। তার চিৎকারে লুসির বাবা বেরিয়ে আসেন। আহত লোকটিকে হসপিটালাইজড করা হয়। ওর অবস্থা খুবই গুরুতর। আজ সকালে সে স্টেটমেণ্ট দিয়েছে, কেন লুসিদের দোতলায় উঠতে গিয়েছিল। ওর সেন্স ফিরলে আমরা মার্থাকে খুন করার স্টেটমেণ্ট নেব। কিন্তু এখন, ক্যাথি,

আমি চাই না তোমার মতো সুন্দর মেয়ের নামে বদনাম হোক। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো আর কখনও ড্রাগ খাবে না, তা হলে এই ব্যাপারটা গোপন থাকবে। তা ছাড়া তোমার কাছে চিনি ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।" ক্যাথি কেঁদে ফেলল। দু' হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "প্রতিজ্ঞা করছি, আমি জীবনে ড্রাগ খাব না।"

ডিটেকটিভ জন হাসলেন, "দ্যাট্‌স লাইক এ গুড গার্ল। এখন মার্থার খুনিকে ধরেই আমাদের কাজ শেষ হয়নি। যারা ওকে বিক্রি করেছিল তাদের ধরতে হবে। ওরাই সত্যিকারের অপরাধী। এবং আপনারা, মায়েরা, আপনাদের বলছি। যখন স্বামী-স্ত্রী কাজে বেরিয়ে যান এবং ওরা একা বাড়িতে থাকে তখন আমাদের একটু ফোন করে জানিয়ে রাখবেন। ওরা অপ্রাপ্তবয়স্ক। কত বিপদ হতে পারে ওদের।" জন বেরিয়ে গেলেন।

ক্যাথির মা তামাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। কে জানে তাঁর মেয়ে মার্থার মতো অবস্থা হতে পারত যদি তামা ওকে সঙ্গ না দিত। ওঁরাও চলে গেলেন।

তামার মা গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন। তামা বলল, "মা, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না? আমি কিন্তু তোমাকে ফোন করার কথা বলেছিলাম।"

তামার মা মাথা নাড়লেন, "তোমায় আমি বিশ্বাস করি তামা।"

"তা হলে মুখ ভার করে আছ কেন?"

"তোমার বড়মামাকে টেলিফোন করেছিলাম।"

"ও। কী বললেন?"

"অন্তুর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

"কী হয়েছে?" চমকে উঠল তামা।

"ও ড্রাগ খাচ্ছে। ফেরোসাস হয়ে গিয়েছে। কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। ঘরে বন্ধ করে রাখলেও ড্রাগ খেতে দিতে হচ্ছে।

পড়াশোনা চুলোয় গিয়েছে। আমি বড়মামাকে বললাম, ওকে এখানে নিয়ে আসতে। এখানে অনেক নতুন চিকিৎসা হচ্ছে এখন। এখনই না বাঁচাতে পারলে তোমার বড়মামার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।''

চুপ করে রইল তামা। তারপর বলল, "মা, ইন্ডিয়াতেও ড্রাগ খায় ওরা ?"

"তোমাকে বলেছি ইন্ডিয়া বলবে না নিজেদের মধ্যে। দেশ বলবে। হ্যাঁ, খায়। এই সর্বনেশে জিনিস যারা বিক্রি করে তারা পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।''

"কিন্তু তুমি বলো দেশের লোক গরিব। গরিবরা কেনে কী করে ?''

"সেইরকম জিনিসই বিক্রি হয়, যা ওরা কিনতে পারে।''

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তামা। সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। কাগজ বের করে চিঠি লিখতে বসল, "পৃথিবীর সব দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী মহাশয়েরা, আপনাদের কাছে আমি, একটি পনেরো বছরের মেয়ে, বিনীত আবেদন করছি যে, আপনাদের দেশে যারা ড্রাগ নিয়ে ব্যবসা করে তাদের একমাত্র শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিন। ওরা মার্থাকে মেরেছে, ক্যাথির বিপদ ডেকে এনেছিল এবং আমার মামাতো ভাই অন্তুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আপনারা এদের কখনও ক্ষমা করবেন না। কোনও অল্প শাস্তি দেবেন না।''

৪

ছেলে বড় হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে কিন্তু তার বেশি ওর সম্পর্কে মাথা ঘামায়নি অমর। কিছুদিন আগে স্ত্রীর মুখে শুনেছিল সে নাকি

টেবিলটেনিস খেলছে। স্কুলে জীবনে কখনও অমর ওই খেলাটা খেলেনি। শুনে বলেছিল, 'দেখো যেন পড়াশুনাটা নষ্ট না হয়।'

আজ সকালে ছেলে বায়না ধরেছিল তার খেলা দেখতে যেতে হবে। ইণ্টার স্কুল টেবিল টেনিস টুর্নামেণ্টে সে নাম দিয়েছে। জীবনের প্রথম কম্পিটিশন। প্রস্তাব শুনে একটু খুশি যে হয়নি সে তা নয়। শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছিল স্কুলে। এবং গিয়ে দেখল প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটি তুখোড় খেলে তার ছেলেকে হারিয়ে দিচ্ছে। অমর প্রতি মুহূর্তে চাইছিল তার ছেলে মারগুলো ফিরিয়ে দিক, জোরে স্ম্যাস করাক কিন্তু হতভাগা কিছুই করতে পারছিল না। সেই সময় উপস্থিত দর্শকরা তার ছেলেকে দুয়ো দিচ্ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী রোগা ছেলেটিকে খুব উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গোহারা হেরে গিয়ে মুখ চুন করে ছেলে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আর বিজয়ী ছেলেটি ছুটে গিয়ে এক প্রৌঢ়া মহিলাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠেছিল। আর দাঁড়ায়নি অমর। কিন্তু তারপর থেকে সে কিছুতেই তার ছেলের হেরে যাওয়া মুখ ভুলতে পারছিল না। কেমন দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। ওর দ্বারা টেবিল টেনিস হবে না। আর হতে গেলে অনেকদিন অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু এইভাবে হারতে আরম্ভ করলে ওর মন ভেঙে যাবে। তার প্রতিফলন পড়বে পড়াশুনায়। অমর স্থির করল স্কুলে গিয়ে গেমস টিচারকে বলবে যে আর ছেলে টেবিল টেনিস খেলবে না।

পরদিন স্কুলে গিয়ে অমর যখন গেমস টিচারের জন্যে অপেক্ষা করছে তখন অবাক হয়ে দেখল সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটির সঙ্গী মহিলা এলেন। খুব রাগ হচ্ছিল অমরের। নিশ্চয়ই ছেলের গৌরবে গৌরবান্বিত। গেমস টিচার আসতেই মহিলা এগিয়ে গেলেন। অমর শুনল তিনি বলছেন, 'স্যার, আমি ঠিক করেছি যে আমার ছেলে আর কখনই টেবিল টেনিস খেলবে না।'

গেমস টিচার অবাক, 'সেকি ? কেন ?'

মহিলা মুখ নিচু করে বললেন, 'আমি আর পারছি না। ওর বাপ মারা গিয়েছেন ছয় বছর হলো। তারপর প্রতিটি ভাল জিনিস করেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, মা, বাবা যদি দেখতে পেত ! কালও বলেছে ওই জেতা ভাল লাগে না বাবা দেখতে পেল না বলে। ওর কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না।

অমর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। গেমস টিচার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কিছু বলবেন ?'

গেমস টিচারের প্রশ্নের জবাবে অমর মাথা নাড়ল, না। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল স্কুল থেকে। বিজয়ী ছেলেটির মুখ মনে পড়ল তার, এবং কান্নাও। তার হেরে যাওয়া ছেলে খেলতে খেলতে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন জিততে পারবে। আর সেই বিজয়ের মুহূর্তে বাবা হিসেবে সে যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তার মুখে হাসি দেখতে পাবে। যা ওই ছেলেটি কখনও পাবে না। মনটা হালকা হয়ে গেল তার।

জিনসের প্যান্ট পরা মেয়েটি ছলবলিয়ে হাঁটছিল। তার দশহাত পেছনে একটি লোক। লোকটির পরণে ওভার কোট, টুপি চোখের ওপর নামানো। হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ। রাস্তা পেরিয়ে মেয়েটি একটি দশতলা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তেই লোকটি তাকে অনুসরণ করল। মেয়েটি লিফটের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি খবরের কাগজ খুলে চোখের সামনে ধরল। কাগজে মোটা অক্ষরে হেডিং লেখা, 'গত রাতেও পার্ক স্ট্রিটের বারের মহিলা শৌচাগারে যুবতী হত্যা।' লোকটি কাগজের আড়াল রেখে মেয়েটিকে দেখছিল। এক জায়গায় স্থির থাকা ওর স্বভাব নয়। এই সময় একজন বৃদ্ধা হাতে বাস্কেট নিয়ে উঠে-এলেন সিঁড়ি ভেঙে লিফটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার গলা পাওয়া

গেল, 'এই যে লিজা, খবরের কাগজে পড়েছ ? কাল রাতেও খুন হয়েছে একটা মেয়ে। উঃ কি কাণ্ড। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সন্ধের মধ্যেই বাড়ি ফিরে এসো।' মেয়েটি খিল খিল করে হাসল, 'আমার কিছু হবে না আণ্টি।'

'বাজে বকোনা। দেখে দেখে যুবতী মেয়েদের মারছে। এই নিয়ে তিনটে হল।'

লিফট এসে যেতেই ওরা ভেতরে ঢুকল। সেই সঙ্গে লোকটি সে মুখ থেকে কাগজ না সরিয়ে এক কোণে দাঁড়াল। বুড়ি ক্রমাগত মেয়েটিকে সাবধান হবার উপদেশ দিয়ে তিনতলায় নেমে যেতেই লোকটা পকেটে হাত ঢোকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একজন প্রৌঢ় লিফটে উঠলেন, 'ওঃ লিজা। কাল অত রাত্রে ফিরলে দেখলাম। শহরে যে কাণ্ড শুরু হয়েছে তাতে কাজটা ভাল করছ না।' লিজা হাসল, 'না, না, আমাকে কেউ কিছু বলবে না।'

ওরা কথা বলছিল। লোকটা হতাশ হল। সাততলায় মেয়েটি নেমে গেল প্রৌঢ়ের সঙ্গে। লোকটা হতাশ হল। তারপর বোতাম টিপে লিফট নামিয়ে আনল নিচে।

ওভারকোট পরা লোকটি রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের একটা দোকানে ঢুকে ফোন করতে চাইল। অনুমতি পেলে সে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে সাড়া পেলে সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্যার, পেয়েছি। ঠিকানাটা বলছি, তাড়াতাড়ি চলে আসুন ফোর্স নিয়ে।'

ওখান থেকে ভারি গলা শোনা গেল, 'প্রুফ পেয়েছ কিছু ?' ওভারকোট পরা লোকটি বলল, 'একেই আমি কাল রাত্রে বার থেকে বেরুতে দেখেছিলাম। তারপরেই বডি আবিষ্কৃত হয়। এখন পাঁচজনে ওকে ভয় দেখাচ্ছে অথচ ও ভয় পাচেছ না। আর বলছেও না ওই বারে ছিল।'

'ছেলে না মেয়ে ?'

'মেয়ে স্যার।' বলে ওভারকোট পরা লোকটি মেয়েটির নাম ঠিকানা জানাল। ওপাশ থেকে হাসির তুবড়ি ছুটে এল, 'এই জন্যে তোমার আজ পর্যন্ত প্রমোশন হয়নি। যার কথা বলছ সে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একজন অফিসার। সবে ঢুকেছে।'

ষাট বছরের ভদ্রলোক নাতির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে রেল লাইনের ধারে এলেন। তিনি তাঁর চাকরির জীবনের গল্প বলছিলেন। সবে অবসর নিয়েছেন। এতদিন রেলে চাকরি করে সবার ভালবাসা পেয়েছেন। সবাই তাকে খুব খাতির করে। বালক নাতি সেইসব গল্প শুনছিল। এমন সময় একটা ট্রেনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। বালক দেখল ইঞ্জিনের ড্রাইভার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হাসি মুখে তার দাদুকে দেখে হাত নাড়ল। ট্রেন পেরিয়ে যাওয়ার আগে গার্ডের কামড়া থেকে গার্ড হাত নেড়ে চিৎকার করে দাদুকে কিছু বললেন আর এই পুরো সময়টা দাদু তাঁর হাত নেড়ে গেলেন। ট্রেন চলে গেলে নাতি বলল, 'দাদু, তোমাকে কত লোক চেনে, না?'

ভদ্রলোক হাসলেন। তৃপ্তির হাসি। কিছু বললেন না।

পঁচিশ বছর কাটল। ভদ্রলোকের বয়স এখন পঁচাশি। নাতির সন্তানের বয়স এখন পাঁচ। অনেকদিন বাদে ভদ্রলোক, তার হাত ধরে এলেন রেল লাইনের ধারে। আসার পথে তিনি নিজের চাকরি জীবনের গল্প বলছিলেন। শিশু অবাক হয়ে শুনছিল। এই সময় একটি ট্রেনকে আসতে দেখা গেল। ভদ্রলোক তার ডান হাত আকাশে নাড়তে লাগলেন। কিন্তু ড্রাইভার তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। ট্রেন চলে যাওয়ার আগে গার্ডের কামরা এল। গার্ড বাইরের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত মুখে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের আন্দোলিত হাত শূন্যেই থেমে গেল। সেটা এখন খুব টনটন করছিল। হঠাৎ শিশুটি বলে উঠল, 'ওমা, দাদু তুমি হাত নাড়ছিলে কেন?'

বৃদ্ধ কথা বলতে পারলেন। পঁচিশ বছর পর দীর্ঘ সময়। এর মধ্যে কখন তিনি বস্তু জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন তা তিনি জানতেন না। গত বছর বেঁচে থেকে নিজের জানাটাকে কত কম আবিষ্কার করে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। শিশুটি সেই সময় বলল, 'দাদু, আমি বাড়ি যাব।' বৃদ্ধ বলতে পারলেন, আমিও।'

পঞ্চাশ বছর বয়সে পেঁছে ননী মাধবের মনে হত যে সংসার থেকে সে কিছুই পায়নি। বাবা পড়াশুনা করিয়েছেন চাকরি করে সংসার বাঁচাতে পারবে সে তিনি অবসর নিলে। সেটা হল। বিয়ের পরে স্ত্রী কয়েক মাস নিরীহ ছিলেন। আহা, বড় সুখের সময় ছিল সেটা। তারপর তার হুকুমমত চলতে চলতে আজকাল নিজেকে বিনি পয়সার চাকর ছাড়া কিছুই মনে হয় না। ননী মাধব মাসে সাড়ে তিন হাজার হাতে পায়। তা থেকে তার মাসিক বরাদ্দ একশ টাকা। এদিয়েই যাতায়াত এবং টিফিন সারতে হয়। পুজোর সময় দু জোড়া সার্ট প্যাণ্ট কিনে দেন স্ত্রী। তার নিজস্ব কোন ঘর নেই যেখানে দুদণ্ড একা কাটাতে পারে। নিজস্ব বিছানা নেই যেখানে গড়াতে পারে। রোজ ছটার আগে বিছানা ছাড়তে হয় তাকে। তারপর দুধ আনা, বাজার করা থেকে সপ্তাহের রেশন, মাসের গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল যাবতীয় কাজ রুটিন বাঁধা। ননী মাধবের দুই পুত্র কন্যা। দুজনই কলেজে পড়ে। তাদের পড়াশুনার চাপ এমন যে এসব কাজ করতে সময় পায় না। করতে বললে স্ত্রী বাধা দেন, 'আহা, ওরা যদি ও সব করে তাহলে পড়বে কখন?'

ননী মাধব হিসাব করে দেখেছে তার পেছনে সংসারের বরাদ্দ দৈনিক আট টাকা। এই অঙ্কের মধ্যেই তার খাওয়া হয়ে যায়। সকালে এক কাপ চা পঞ্চাশ পয়সা, অফিস বেরুবার আগে ভাত

তরকারি মাছ পাঁচ টাকা। বিকেলে এক কাপ চা পঞ্চাশ রাত্রে দুটো রুটি আর তরকারি দুটো টাকা। অর্থাৎ এই অঙ্কের সঙ্গে হাত খরচের টাকা যোগ করলে মোট তিনশ চল্লিশ সে উসুল করে মাসে তিন হাজার দিয়ে। সংসারের কোন ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয় না। মতামত দিলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। ছেলে মেয়েরা জানে মায়ের হাতে ক্ষমতা আছে তাই তারা তাঁর পক্ষে আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় বিপ্লব করবে। কিন্তু বেড়ালকে প্রথম রাত্রে না মারলে যে আর কিছুই করার থাকে না তা টের পেয়ে গেছে এতদিনে। এখন বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই তার।

অতএব চোরের মত সে গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কাউকে না জানিয়ে সে এই সংসার থেকে চলে যাবে। এখনও আট বছর চাকরি আছে। স্বেচ্ছা অবসর নিলেও এক গাদা টাকা পাওয়া যাবে। গোমুখের আগে হিমালয়ে গুহা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সঙ্গে খাওয়া দাওয়া মোট পাঁচশো টাকা মাসে, তাই দিয়েই সে আরামে থাকবে। নিজেরটা নিজে বুঝে নেবে। স্ত্রীর রক্তচোখের পরোয়া করবে না সে।

কিন্তু এখন মাসের আঠাশ তারিখ। হাত শূন্য। এক তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। মোটে দুদিন। সেই সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে সে হুঙ্কার দিল, 'আমি আজ একা শোব। শরীর খারাপ। খোকা, তুই মায়ের ঘরে যা।'

ছেলের গলা শুনে অবাক হয়ে গেল। সে গেল মাকে রিপোর্ট করতে। জামা কাপড় খুলে লুঙ্গি পরে ননী মাধব বিছানায় গড়াগড়ি করল ঘরের দরজা ভেজিয়ে। আহা, কি আরাম। মনে মনে বলল, 'এই তো সবে শুরু!'

সেই সন্ধ্যায় এবং রাত্রের প্রথমার্ধে ঘরে কেউ এল না। মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে ননী মাধব দেখল স্ত্রী পাশে এসে বসেছেন,

'তোমার কি হয়েছে গো ? ছি, এমন করো না। আমি কি তোমার পর ? বল কি হয়েছে ?'

ননী মাধব ঢোক গিলল, 'আমি-আমি- হিমালয়ে যাব।'

'ওমা এই কথা। শুনে ফেলেছ বুঝি ? আমি তো আজই চারজনের জন্যে টিকিট কাটিয়ে এনেছি। এই গরমের ছুটিতে আমরা হরিদ্বার-কেদার-বদ্রী যাব। রুটি তরকারি নষ্ট করো না, ওঠো, খেয়ে নাও।'

৫

রিক্সায় বাড়ি ফিরছিলেন অবনীমোহন। তাঁর বাঁ দিকে বাসব বসে আছে। বাসবের শরীর ইদানীং এত ভারি হয়েছে যে এক রিক্সায় সহজভাবে বসা যাচ্ছে না। পার্টি অফিস থেকে বেরুবার সময় বাসব বলেছিল, 'দাদা, আপনি এখনও রিক্সায় যাওয়া আসা করছেন কেন ? গাড়ি তো আছেই !' অবনীমোহন মাথা নেড়েছিলেন, 'নাহে, চল্লিশ সাল থেকে এই শহরে হেঁটে বেড়িয়েছি, শক্তি কমে এসেছে বলে রিক্সায় চড়ি কিন্তু গাড়িতে উঠলে হুস্ করে পৌঁছে যাব। শহরটা দেখতেই পাব না।

বাসব আর কথা বাড়ায়নি। তাঁর পাশে উঠে বসেছিল। একটু চেপে বসে জায়গা করে দিতে হয়েছে ওকে। বাসব তার হাতে গড়া ছেলে। জেলার এম পি। গত নির্বাচনে প্রচুর ব্যবধানে জিতেছে সে। ছেলেটি ভাল।

এখন সকাল। অবনীমোহন দেখলেন যেতে যেতে বাসব হাত তুলে একে ওকে স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। এক সময় রাস্তা

ফাঁকা হলে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি এখনও এসব ছেঁদো কেস নিয়ে কেন মাথা ঘামান ?'

'ছেঁদো কেস ?'

'ওই যে সুলতা না কি নাম মেয়েটার ?'

'এটা ছেঁদো কেস নয় বাসব। শহরটাকে তো জানো। মানুষ এমন একটা ইস্যু পেলে সমালোচনা করতে ছাড়বে না। হয়তো এই একটা ঘটনাই অনেককে বিরূপ করে তুলবে।'

'সোমনাথরা তো ব্যাপারটাকে ম্যানেজ করতে চাইছে। কেউ জানতেও পারবে না।'

অবনীমোহনের চোয়াল শক্ত হল, 'কেসটা কে নিয়ে এসেছে ? কল্যাণ। তাই না। সে আমাদের ছেলে। কল্যাণ মনে করছে সুলতার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আর সেটা যে করা হয়েছে তাতে তো কোন প্রশ্ন নেই।'

বাসব হাঁটুর ওপর ডান হাত রেখেছিল। সেটা তুলে রাস্তায় দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে নেড়ে হাসল। রিক্সা বেরিয়ে গেলে বাসব হাত নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আমরা সতীদিকে বিপদে ফেলতে পারি না। গত পাঁচ বছরে ভদ্রমহিলা দলের জন্যে যা করেছেন তার কোন তুলনা নেই।'

'তুমি আমাকে আপোস করতে বলছ বাসব ?'

'দেখুন, এখন কিছুই করা যাবে না। মেয়েটি ইতিমধ্যে পাঁচ মাসের প্রেগন্যাণ্ট। ওর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। সতীদির ভাই কলেজে পড়ে। ওকে আমরা বাধ্য করতে পারি না একটা মেইড সার্ভেণ্টকে বিয়ে করতে। দুটো লোক, একটা ফ্যামিলির জীবন তাতে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কিন্তু একটা ছেলে অতবড় অন্যায় করে শাস্তি পাবে না ?'

'আপনি বুঝতে পারছেন না। শাস্তি দিতে গেলে পুলিস কেস করাতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজগুলো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমাদের দলের একজন নেত্রীর ভাই এই করেছে। এখন এমন প্রচার আমরা করতে দিতে পারি না। সোমনাথ বলছে সতীদি আগে যা বলেছেন বা করেছেন তা ভুলে গিয়ে সুলতার পুনর্বাসনের জন্যে হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। সুলতাও এতে রাজী হয়েছে। কল্যাণের সঙ্গে সোমনাথরা কথা বলবে। আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না।' কথা শেষ করে বাসব আবার একজনকে হাত নাড়ল। রিক্সাওয়ালা খুব যত্ন নিয়ে চালাচ্ছিল। সে জানে এই জেলার সবচেয়ে দামী দুটি মানুষ এখন তার সওয়ার। অবনীমোহনের বাড়ির সামনে পেঁছে সে সসম্ভ্রমে নেমে দাঁড়াল। অবনীমোহন পকেট থেকে টাকা বের করছিলেন, রিক্সাওয়ালা জোরে মাথা দোলাতে লাগল, 'না স্যার, দিতে হবে না। আমি নিতে পারব না।'

'স্যার! তুই আমাকে স্যার বলছিস। ওহে বাসব, একি বলছে শোন।'

'স্যার কথাটা আজকাল সবাই শিখে গেছে দাদা।'

'নাহে। আজ তুমি সঙ্গে আছ বলে ওর মুখে স্যার বেরিয়েছে। টাকাটা ধর, আমি বিনা পয়সায় কাউকে খাটাই না। ধর বলছি।' শেষ শব্দ দুটোয় এতটা জোর ছিল যে রিক্সাওয়ালা আর আপত্তি করতে পারল না।

গেট খুলে বাড়ির দিকে যেতে যেতে বাসব বলল, 'দাদা, এই জন্যে আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করি। তবে আপনাদের মত মানুষ খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না। বাড়ির বাঁ দিকের ঘরটি তাঁর। বসা পড়া এবং শোওয়ার। বাড়িটি পৈত্রিক, বাকি অংশে তাঁর ভাই-এরা থাকেন। অকৃতদার অবনীমোহনের একটি ঘরই যথেষ্ট। বেতের চেয়ারে বসতে দিয়ে তিনি বাসবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু চা খাবে?'

বাসব রুমালে মুখ মুছল, 'আবার ওদের খাটাবেন ?'

'বউমা এটাকে খাটনি বলে মনে করেন না। তাছাড়া এখন তো বাড়িতে অনেক মেয়ে। ভাইপোর বউ, তাদের মেয়ে এবার ক্লাশ টেনে উঠল। দাঁড়াও, বলে দিই ওদের।'

অবনীমোহন ভেতরে চলে গেলেন। বাসব চারপাশে তাকাল। এই ঘরে সে গত কুড়ি বছর ধরে আসছে। একটুও পরিবর্তন হয়নি কোথাও। তক্তাপোশ, বেতের চেয়ার, আলনা, কুঁজো গ্লাস এবং বই-এর তাক একই রকম রয়ে গেছে। সারাজীবন মাস্টারি করেছেন অবনীমোহন। জেলে গিয়েছেন অনেকবার। এখন তিনি সরকারি-ভাবে এই জেলার পার্টির সভাপতি। তিনি থাকায় দলের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে সম্ভ্রম এসেছে। অথচ অবনীমোহনের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। আজ যাঁরা মন্ত্রী তাঁদের অনেকেই ওঁর পরে দলে এসেছেন। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা মনে করেন অবনীমোহন ইচ্ছে করেই জেলার বাইরে যেতে চাননি।

বাসব বইগুলোর দিকে তাকাল। অবনীমোহন এদের বন্ধু বলেন। এক সময় সে এখান থেকে অনেক বই নিয়ে গিয়েছে পড়ার জন্যে। কিন্তু বই-এর তত্ত্ব এবং জীবনের সত্য যখন মুখোমুখি হল তখন তাকে জীবনকেই বেছে নিতে হয়েছে। অবনীমোহন এখনও তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বলা যায় তাঁর বাস এখনও ওই বই-এর লাইনে লাইনে। ফলে অবনীমোহন দলের মূলস্রোতের সঙ্গে ঠিকঠাক গা ভাসাতে পারছেন না। সোমনাথরা এই কথাই তাকে বলছিল। জেলা থেকে নির্বাচিত এম পি বলে তার নিজস্ব কিছু ক্ষমতা আছেই। কিন্তু দলের প্রশাসনিক ব্যাপারে সে মাথা ঘামায় না। আজ যখন অবনীমোহন বললেন তার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে চান তখন বাসব আপত্তি করেনি। মনে হয়েছিল এই সুযোগে গুরুকে একটু বাস্তবমুখী করা যেতে পারে। সুলতা কেসটা নিয়ে উনি খুবই অখুশি। সতী দত্ত অধ্যাপিকা। কল্যাণই

তাঁকে দলে এনেছিল। তারপর ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। এখন দলের মহিলা শাখার নেত্রীত্ব ওঁর হাতে। সেই সতী দত্তের বাড়িতে সুলতা চাকরি করত। কল্যাণের অভিযোগ অসহায় মেয়েটিকে সতী দত্তের ভাই-এর কারণে গর্ভবতী হতে হয়েছে। ব্যাপারটা জানতে পেরে সতী দত্ত সুলতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মেয়েটির কোন আত্মীয়স্বজন দায়িত্ব নিতে চায়নি। মা বাবা নেই। কিন্তু সুলতা কি করে কল্যাণের কাছে পেঁাছালো সেটাই বিস্ময়ের। আর তারপর থেকে কল্যাণ ওকে সাহায্য করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তবু কল্যাণ দলের ছেলে। যদি বিপক্ষের কেউ খবরটা জানত তা হলে বিপাকে পড়তে হত। সতীকে দলের জন্যই দরকার। অবনীমোহন যেটা চাইছেন সেটা ন্যায়সঙ্গত। এই ন্যায়বোধের কথা বই-এর পাতায় লেখা থাকে। জীবন আরও ব্যাপক। যেখানে যে সত্যিটা জন্ম নেয় তা প্রয়োজনের মাপকাঠিতে। তাই সতীর দেওয়া হাজার টাকা সুলতাকে অখুশি করেনি। সে চলে গিয়েছে শহরের বাইরে।

অবনীমোহন এলেন। পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন। তক্তাপোশে বসে হাসলেন, 'তোমাকে যে কারণে নিয়ে এলাম, বাসব, আমি এবার বিশ্রাম চাই।'

'বিশ্রাম? মানে?' বাসব চমকে উঠল।

'আমার বয়স ঢের হল। শরীরও ঠিক নেই। আগের মত খাটাখাটনি করতে পারি না। তার ওপর যেটা সত্যি তা হল, এখনকার রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারছি না। নিজের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ করতে হয়। তুমি আমাকে দাদা বলে মনে করেছ চিরকাল, আমার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।' অবনীমোহন শান্ত গলায় বললেন।

দ্রুত মাথা নাড়ল বাসব, 'অসম্ভব। এখন আপনাকে ছাড়া যাবে না।'

'কেন ? যা কিছু সিদ্ধান্ত তা তো তোমরাই নিচ্ছ।'

'এটা আপনার অভিমানের কথা। আপনাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছুই করিনি।'

'আমি সম্মতি দিয়েছি। না দিলে কাজ আটকে যেত, তাই।'

'দাদা আপনি যেভাবে বলছেন তাতে যে কেউ মনে করবে আপনাকে আমরা ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সুলতার কেসটা নিয়ে আপনি একটু বেশী ভাবছেন।'

'সুলতা একা নয় বাসব।' হাসপাতালে আন্দোলনের নামে যা করা হয়েছিল আমি তার বিরোধী ছিলাম। চাবাগান অঞ্চলে দলের ছেলেদের পার্টির চাঁদার রসিদবই বিলিয়ে দিয়ে কোন হিসেব না চাওয়া আমি মানতে পারিনি। বাসব, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, নিজেকে কি বোঝাব ?' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন, 'আমরা ক্রমশ বুর্জোয়া ড্রেসিংরুমের শিকার হয়ে যাচ্ছি।'

বাসব হাসল, 'আপনি সোনার পাথরবাটি চাইছেন। এই সংবিধান মানবার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। নির্বাচনে আর কোন গরীবদের দল জিততে পারে না। কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। বিশাল মেশিনারি লাগে। বুর্জোয়াদের লালনে যে দল লড়ছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সমপর্যায়ে নিজেদের নিয়ে যেতে হয়, অন্তত অর্থবল এবং লোকবলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমরা আমাদের পথে অবশ্যই চলব। কিন্তু কিছু ফাঁক তো থেকেই যায়। দাদা, আমরা যতদিন বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছি ততদিন আপনার ওই বইগুলোর তত্ত্ব আমাদের কাজে লেগেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সরকার বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথে চলতে পেরেছিলাম। কিন্তু সরকার চালাতে গিয়ে অনেকসময় আমাদের হয়তো আদর্শচ্যুত হতে হচ্ছে। তবে এখানেও প্রশ্ন, আদর্শ কোনটা সেটা শালগ্রাম শিলা হতে পারে না। এক পয়সা ট্রামবাস ভাড়া যখন বাড়ানো হয়েছিল তখন

আমরা আন্দোলনে জনসাধরণকে সঙ্গে পেয়েছিলাম। কিন্তু তিরিশ বছর পরে সরকার চালাতে গিয়ে খরচের বহরে যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন নিজেরাই ভাড়া বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। প্রতিপক্ষ যে আন্দোলন শুরু করেছে তাকে অগণতান্ত্রিক বলতে বাধ্য হচ্ছি। এছাড়া কোন উপায় নেই। আর এই সব করেই আমাদের সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করতে হবে। এই অবস্থায় আপনি সরে দাঁড়ালে জনসাধারণ আমাদের সন্দেহ করবে। শাসন যার হাতে তাকে তো সাধারণ মানুষ বন্ধু বলে মনে করে না। আমরা যতই বলি জনসাধারণের বন্ধু আমরা, তবু তারা দূরত্ব রাখবেই। এ অবস্থায় আপনার চলে যাওয়া মানে ওদের ভাবনাকে আরও মজবুত করা।' বাসব কথা শেষ করা মাত্র একটি কিশোরী দু কাপ চা নিয়ে এল। বাসব তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে নন্দিনী না, কত বড় হয়ে গেছিস ?'

নন্দিনী চায়ের কাপ দিয়ে বলল, আজকাল তো আপনি আসেনই না।'

'হ্যাঁরে, সময় পাই না। দিল্লি আর কলকাতা করতে করতে নিশ্বাস ফেলতে পারি না।' চায়ে চুমুক দিল বাসব। নন্দিনী দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

'কোন ক্লাশ এবার ?'

'টেন। আসছি।' নন্দিনী চলে গেল।

চা খেয়ে বাসব বলল, 'দাদা, আপনি নেক্সট ইলেকশন পর্যন্ত চুপ করে থাকুন। এমনিতেই হঠাৎ হাওয়াটা একটু গরম হয়ে উঠেছে। এসব কথা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করবেন না।'

'না। আমার মনে হয়েছিল তুমি শিক্ষিত ছেলে, পড়াশুনা করেছ, তুমি বুঝবে।'

বাসব উঠে দাঁড়াল, 'আপনি তো জনসাধারণকে চেনেন। কোন কোন নেতার একটু বেহিসাবী কথায় তারা খেপে উঠেছে। কিন্তু

আমাদের প্রতিপক্ষ এত বিশৃঙ্খল যে তাদের শান্ত করতে বেশী সময় লাগবে না। সেক্সপীয়ার সাহেব তো জনতার চরিত্র বলেই গিয়েছেন।'

অবনীমোহন দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন বাসবকে, 'ওইটেই বোধহয় ভুল হচ্ছে বাসব। ঢেউ-এর ধাক্কায় কণা কণা বালি কখন যে নিজেরাই জড়ো হয়ে একটা বিরাট চর হয়ে যায় তাই আগে ঠাওর করা যায় না। বিরোধ যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন নেতৃত্ব আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়। আমরা এটাই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।'

বাসব মাথা নাড়ল। রাস্তায় পা দিয়ে সে পেছন ফিরে তাকাল। অবনীমোহন তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। মানুষটি সত্যি ভাল। তার আজকের যা কিছু উন্নতি সব ওই একটি লোকের জন্যে। না অবনীমোহনকে এখন কিছুতেই ছাড়া যেতে পারে না। কিছুদিন আগে সুধাময় চৌধুরী কলকাতার পার্টি অফিসে বসে বলেছিলেন, 'বাসব, অবনীর মত একজন আমাদের দলে আছে এটা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে। ও জেলা থেকে বেরিয়ে এলে দেশের অনেক বেশী উপকার হত।' পুরোনদিনের লোক যাঁরা তাদের এমনই ধারণা ওঁর সম্পর্কে। চারপাশে তাকিয়ে বাসব একটিমাত্র রিক্সওয়ালাকে দেখতে পেল। তাকে দাঁড়াতে দেখেই সে রিক্সা নিয়ে এগিয়ে আসছে, 'চলুন স্যার।' সঙ্গে সঙ্গে বাসবের মনে পড়ল এই লোকটাই তাদের নিয়ে এসেছিল। সে হেসে বলল, 'তুমি এখনও এখানে? এর মধ্যে ভাড়া পাওনি?'

'পেয়েছি স্যার। নিইনি। আপনি তো ফিরে যাবেন।'

রিক্সায় উঠে বসল বাসব। তার ভাল লাগল। একেবারে, যাকে বলে রুট লেভেলে সে চলে গিয়েছে। একজন রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত তাকে খাতির করছে। কিন্তু ও কি চায়? এখন জেলায় এলেই যারা ভিড় করে তারা কিছু না কিছু চায়। লোকগুলো

যখন বোঝে বিধানসভা বা কলকাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, লোকসভা বা দিল্লীতেই তার কাজকর্ম তখন খুব হতাশ হয় সবাই। একমাত্র বড় ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ তাই বিব্রত করতে পারে না তাকে। এম. পি. হয়ে খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছে সে। মুখ ফিরিয়ে সে শেষবার তাকাল, অবনীমোহন দাঁড়িয়ে আছেন।

অবনীমোহন শূন্য রাজপথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাসব যা বলে গেল তার সবটাই ওর দিক থেকে সত্যি। বিরুদ্ধ ভাবনাটা তাঁর মনে আজই প্রথম এল না। দল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে এমন দানা বাঁধছিল। নিজেকে বুঝিয়েছিলেন মতে মিলছে না বলে সরে দাঁড়ালে কাজের কাজ তো কিছুই হবে না। ক্ষমতাহীন অবস্থায় ঘরে বসে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারবেন না। তবু জেলার সর্বোচ্চ পদে থেকে তিনি কিছুটা কাজ নিজের মত করে করতে পারছেন। ভেবেছিলেন বাসব তাঁর কথা বুঝতে পারবে। এখন মনে হচ্ছে বুঝেও বাসব তাকে মানিয়ে চলার নীতি নিতে বলছে। কিন্তু একটা মানুষ কতখানি মেনে নিতে পারে? গ্রামের প্রায় সবগুলো পঞ্চায়েত এখন তাঁদের দখলে। যদিও পঞ্চায়েতের সদস্যরা কিছু চামচে নিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। এখন নির্বাচনে জিততে জনসাধারণের দেওয়া ব্যালটের ওপর নির্ভর করতে হয় না। তাই পরবর্তী নির্বাচনেও ওরা জিতবে। কিন্তু আগুন একদিন জ্বলবেই। পার্টি ফাণ্ডে হাজার টাকা চাঁদা না দিতে পারার অপরাধে এক সম্পন্ন কৃষিজীবী পরিবারের চাষবাস বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ তার জমিতে চাষ করতে যেতে পারবে না। যারা চাষ করত তাদের দিয়ে বেশী মজুরী দাবী করানো হল। পরিবারটি এক বছর চাষ বন্ধ রাখল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় বাধ্য হল হাজার টাকার চাঁদা দিতে। এই বাধ্য হওয়া মানুষগুলোর বুকে আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। তিনি

খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কখনই ও গ্রামের শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি অত টাকা চাঁদা আদায় করতে। অথচ তারা করছে। এসব খবর জানা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। থানা তো এখন অতিরিক্ত রকমের তাঁবেদার। এই আধা ফ্যাসিস্ত ক্রিয়াকলাপ বেশীদিন চলতে পারে না। কিন্তু একথাও ঠিক, পদত্যাগ করলে তিনি কোন সুরাহা করার সুযোগই পাবেন না।

অবনীমোহন দেখলেন শূন্য রাজপথে একটি রিক্সা আসছে। রিক্সার সওয়ারি এই শেষ-সকালেই মাথায় ছাউনি ফেলেছে। রিক্সাটি অবনীমোহনের বাড়ির সামনে এসে থামল। রিক্সাওয়ালা সওয়ারিকে বাড়িটা দেখিয়ে কিছু বলতেই লোকটা ভাড়া মেটাল। তারপর একটা কাঁধে ঝোলানো বড় ব্যাগ নিয়ে নেমে দাঁড়াল।

দরজায় দাঁড়িয়ে অবনীমোহন লোকটাকে দেখলেন। বছর তিরিশেক বয়স। ভাঙা গাল। কাঁধ অবধি চুল। চেক সার্ট আর বিবর্ণ জিনসের প্যান্ট পরে কাঁধে ব্যাগ ফেলে এগিয়ে আসছে। প্রায় মুখোমুখি হতেই লোকটা জিজ্ঞাসা করল, অবনীমোহনবাবু আছেন?'

'আমিই অবনীমোহন।'

'অ। ভেতরে চলুন, কথা আছে।'

'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'কলকাতা থেকে। চলুন ভেতরে বসে কথা বলব।'

লোকটার বলার ভঙ্গীতে যে ঔদ্ধত্য রয়েছে সেটা অবনীমোহনকে বিরক্ত করল। অশিক্ষা থেকেই মানুষ এই ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার কি দরকার তা এখানে দাঁড়িয়ে বলতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?'

লোকটা চারপাশে তাকাল, 'পাবলিক শুনুক আমি চাই না। হোলনাইট জার্নি করে এসেছি। হেভি টায়ার্ড। বসেই কথা বলতে চাই।'

অতএব অবনীমোহন ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। নিজে তক্তাপোষে বসে লোকটাকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। লোকটা তাঁর ঘরের চেহারা দেখছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি তো জেলা কমিটির চেয়ারম্যান?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'কতদিন হয়েছেন?'

'আগাগোড়া।'

'যাঃ শালা!

'মানে?'

'এ্যাদ্দিনেও বাড়িঘরের চেহারা পাল্টাতে পারেননি?'

'কি চান আপনি?' চোয়াল শক্ত হল অবনীমোহনের।

বুক পকেটে রাখা একটা ভাঁজ করা খাম বের করে অবনীমোহনের দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকটা। খামটা নিয়ে মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন তিনি। সত্যর চিঠি। অত্যন্ত ক্ষমতাবান মন্ত্রী। বছর কুড়ি হল পার্টিতে এসেছে। কয়েকবার জেলায় এসেছে। তাঁকে খুব দাদা দাদা করে। সম্ভবত প্রবীণ নেতাদের মুখে তাঁর কথা শুনেছে। সেই সত্য চিঠি লিখেছে।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু। পত্রবাহক শ্রীমান বলাই গুপ্ত আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। সে দলের সদস্য না হলেও সক্রিয় কর্মী। আজ যখন বিরুদ্ধপক্ষের মদত দিতে কিছু বুর্জোয়া কাগজ আমাদের পেছনে লেগেছে তখন আমাদের সংগ্রামে নামতেই হচ্ছে। যাহোক শ্রীমান বলাই-এর নামে কয়েকটি মিথ্যে এফ, আই, আর করা হয়েছে। মিথ্যে বলেই পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু খবরের কাগজগুলো প্রতিদিন এমন চাপ দিচ্ছে যে পুলিসকে আর নিষ্ক্রিয় রাখা যাচ্ছে না। তাই ওকে আমি আপনার কাছে পাঠালাম। অন্তত মাসখানেক আপনি ওর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন। আপনার কাছে ওকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দলের জন্যে আপনার অবদানের

কথা আমরা সবাই জানি। শ্রীমানকে আশ্রয় দেওয়া দলের প্রতি কর্তব্য বলে মনে করলে বাধিত হব। ওর সমর্থনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করার কথা চিন্তা করছি। নমস্কার সহ আপনার সত্য দত্ত।'

অবনীমোহন চিঠিটি শেষ করে বলাই গুপ্তের দিকে তাকালেন। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কলকাতা থেকে কিসে এলেন ?'

'রকেটে। কৃষ্ণনগর থেকে উঠেছি।'

'কেন ?'

সতাদা বললেন, বুলু চান্স নিও না। এসপ্ল্যানেডে গেলে পাবলিক চিনে ফেলতে পারে! তাই প্রাইভেট কারে কৃষ্ণনগরে পাঠালেন। ওখানে রকেট এসে থামতেই উঠে পড়লাম।

অবনীমোহনের মনে হল এই লোকটিকে নিছকই মাস্তান বলা যায়। পেশীশক্তির প্রয়োজন আপনা থেকেই হচ্ছে। অথবা পেশীশক্তি যাদের আছে তারা নিজেদের প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দলের ছায়ায় আসছে। এখন সেই অর্থে তত্ত্বসর্বস্ব রাজনৈতিক দল প্রায় সোনার পাথর বাটির মত ব্যাপার। অবনীমোহনকে মানতে হয়েছে। আটচল্লিশ সালের অবনীমোহনের সঙ্গে সাতষট্টির অবনীমোহনের যেমন অনেক অমিল ছিল, নব্বুইতে এসে তিনি প্রচুর পাল্টেছেন। এসব সত্যি। কিন্তু এই শহরে তথাকথিত পেশীশক্তি নিয়ে যারা ঘোরাফেরা করে তাদেরও একটা পারিবারিক দিক আছে। শেকড়ছাড়া কেউ নয়। আর তারা অবনীমোহনের সামনে এলে মাথা নিচু করে কথা বলে। অবশ্য সামনে আসার অস্বস্তি থেকে দূরে থাকতেই তারা পছন্দ করে।

অবনীমোহন বললেন, 'আপনি একটু বসুন। আমার কিছু জানার আছে।'

বলাই হাত নাড়ল, 'আমি তো মাসখানেক এখানে থাকব। পরে

জানলে ক্ষতি আছে? আমার এখনই ল্যাট্রিনে যাওয়া দরকার। হোল নাইট জার্নি করেছি।'

অবনীমোহন উঠলেন। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটি স্নানঘর এবং পায়খানা আছে। ব্যবস্থাটা অনেকদিনের। বাড়ির লোকজনকে বিব্রত না করতেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। একসময় তাঁর ঘরেই প্রচুর সভা হয়েছে। অনেক মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। সে সময় ওই ব্যবস্থা করা। বলাইকে ইশারায় তিনি ভেতরে নিয়ে এলেন। এক চিলতে উঠোন। উঠোনের পরেই মূল বাড়ি। সেদিকে না গিয়ে তিনি বলাইকে নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

বলাই বলল, আমার ব্যাগ বাইরে পড়ে রইল কিন্তু- !

'এখানে কোন চুরি চামারির ভয় নেই।

'ওর ভেতরে মাল আছে। একটু নজর রাখবেন।' বলাই ঢুকে গেল। অবনীমোহন ফিরে এলেন বাইরের ঘরে। তক্তাপোশে বসে সত্যর চিঠিটা আবার পড়লেন।

সব কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছিল অবনীমোহনের। জীবনে তাঁকে দুবার আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে হয়েছিল। পার্টিকে যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল আর জরুরী ব্যবস্থা জারি হবার সময়। সেটা ছিল পুলিসের নজর থেকে দূরে সরে থাকা, সাধারণ মানুষের সাহায্য পেয়েছিলেন অনেক। একটা সততাবোধ সেইসময় তাঁদের অনুপ্রাণিত করত।

পায়ের শব্দে অবনীমোহন চোখ খুললেন। নন্দিনী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, 'কে এসেছে দাদু?'

'কলমাতা থেকে একজনকে পাঠানো হয়েছে।'

'কেন?'

'ও এখানে কিছুদিন থাকবে। তুমি ভেতরে যাও।'

'মা জিজ্ঞাসা করল তোমার জলখাবার এখন দেবে কিনা?'

মাথা নাড়লেন অবনীমোহন, 'না, এখন খাব না। তুমি বরং ভেতরে যাও।'

'কেন?'

অবনীমোহন কি জবাব দেবেন বুঝতে পারলেন না। বলাই-এর সামনে নন্দিনী থাকুক তিনি পছন্দ করছেন না, এ-কথাটা কিভাবে বলবেন, নাতনির হাত ধরে তিনি বললেন, 'আমরা এখন কিছু জরুরী কথা বলব তো, তাই তোমাকে ভেতরে যেতে বলছি।

'ও, তাই বল। লোকটার নাম কি দাদু?'

'বলাই।'

নন্দিনী হেসে উঠল, 'ওর চুলগুলো দেখেছ?' অমিতাভ বচ্চনের নকল করা।'

'তুমি কি করে দেখলে?'

'বাঃ। আমি তো ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'বুঝলাম। এবার যাও।'

নন্দিনী যখন চলে যাচ্ছে সেইসময় বলাই ঢুকল। জামাপ্যান্ট পাল্টানোর চেষ্টা করে নি কিন্তু একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে। চলে যাওয়া নন্দিনীর দিকে সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। অবনীমোহনের এটা পছন্দ হল না।

চেয়ারে বসে বলাই বলল, 'আঃ, এবার আরাম লাগছে। কিষাণগঞ্জের কাছে রাস্তা যা খারাপ ছিল, কি বলব আপনাকে।'

'আপনার ব্যাগে কি আছে?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কি আছে মানে?'

'বাথরুমে ঢোকার সময় বলছিলেন।'

'অ। রিভলবার!'

'আপনি রিভলভার নিয়ে ঘুরছেন? লাইসেন্স আছে?'

এবার শব্দ করে হাসল বলাই, 'আপনি কোন জগতে বাস করেন

বলুন তো? এই শহরে যারা অ্যাকশন করে তারা কি লাইসেন্স নিয়ে রিভলভার চালায়?'

'এখানে ওসবের প্রয়োজন হয় না।'

'তাই নাকি? প্রথম শুনলাম। আমি কোন ঘরে থাকব?'

'কোন ঘর মানে?'

'বাঃ, সত্যদা বলেছেন আপনি থাকার ব্যবস্থা করবেন।'

অবনীমোহন উঠে দাঁড়ালেন। মনে মনে বললেন, অসম্ভব। এবাড়িতে কিছুতেই নয়। এই মুহূর্তে ওকে তাড়িয়ে দিতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু সত্যর অনুরোধ তিনি ঠেলতেও পারছেন না। লোকটাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠানো দরকার যেখানে গিয়ে ওকে একদম একা থাকতে হবে। হঠাৎই তাঁর মনে পড়ল সেই ফরেস্ট বাংলোটার কথা প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলে বাংলোটা রয়েছে সেখানে কোন ট্যুরিস্ট যায় না। ডি এফ ও-র সঙ্গে কথা বলা দরকার এবং তার আগে থানাতে যেতে হবে। এই একমাস বলাইকে যেন কেউ বিরক্ত না করে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

অবনীমোহন বললেন, 'দেরি করে লাভ নেই। চলুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'আপনার একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। আমার এখানে সেটা সম্ভব নয়। সারাদিন প্রচুর লোক আসেন। একটা ফরেস্ট বাংলোয় ব্যবস্থা করছি ওখানে চৌকিদার আছে, সেই রান্না করে দেবে। মাসখানেক জঙ্গলের বাইরে আসবেন না।'

'বাঃ। ওরকম জায়গায় একা থাকলে পুলিশ সবচেয়ে আগে টের পাবে।'

'টের যাতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি। চলুন।'

আদ্দেকের চেয়ে কম বয়সের লোকটাকে অবনীমোহনের তুমি

বলতে ইচ্ছে করছিল না। আর মজার ব্যাপার, বলাই তাঁকে একবারও অনুরোধ করেনি তুমি বলতে। এতে স্বস্তি পাচ্ছেন তিনি।

নিতান্ত অনিচ্ছায় তাঁর পাশে রিক্সায় বসে বলাই জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূরে?'

'বাসে ঘণ্টা দুয়েক লাগে।'

'আমার কাছে বেশী মালকড়ি নেই।'

'ঠিক আছে।' বলতেই মাল শব্দটা থেকেই রিভলভারের কথা মনে হল। অবনীমোহন বললেন, 'আমরা প্রথমে থানায় যাব।'

'থানা? থানা কেন? চমকে উঠল বলাই।'

'আপনার নিরাপত্তার জন্যে।'

'আপনার মতলবটা কি বলুন তো?

'সত্য আপনাকে পাঠিয়েছে। তাই ওর অনুরোধ রাখছি। একটা কথা, আপনার রিভলবারটা আমাকে দিন। পুলিশের চরিত্র আমি বুঝি না। ওরা কিছু করবে না তবু থানার ভেতরে আপনার কাছে রিভলভার না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'পুলিশের নজর এড়াতে এতদূরে এলাম আবার আমাকেই কেন থানায় নিয়ে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। দু-নম্বরী কিছু করতে চাইলে সত্যদা কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না মনে রাখবেন।' প্রায় শাসানোর ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেও ব্যাগ খুলে হাতের আড়ালে রেখে রিভলভারটা বের করে অবনীমোহনকে দিল বলাই। অবনীমোহন জীবনে প্রথমবার রিভলভার ধরলেন। কাঁপা হাতে পকেটে রেখে দিলেন তিনি। বলাই বলল, 'সাবধানে রাখবেন। লোড করা আছে।'

থানার গেট পেরিয়ে রিক্সাটা থামতেই ভাড়া মিটিয়ে দিলেন অবনীমোহন। তাকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য। আমাকেই তো ডেকে পাঠাতে পারতেন। আসুন।'

দারোগার ঘরে বসে অবনীমোহন দেখলেন বলাই খুব শক্ত হয়ে বসে আছে। খুব ভয় পাওয়া একটা মানুষের চেহারা এরকম হয়। অবনীমোহন হাসলেন, 'আমাকে একটু টেলিফোনে ডি এফ ও-কে ধরিয়ে দেবেন?'

দারোগা বললেন, 'নিশ্চয়ই। একটু আগে ডি এফ ও বাংলোয় ফিরে গেলেন। দাঁড়ান, দেখছি।' রিসিভার তুলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তিনি।

অবনীমোহন বললেন, 'কেমন আছেন ডি এফ ও সাহেব?'

'আর বলবেন না, বয়স হচ্ছে এবার টের পাচ্ছি।'

'একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

মিনিটখানেকও লাগল না। ডি এফ ও খুশী হয়ে অনুমতি দিলেন। তিনি এখনই ওই ফরেস্ট এলাকার অধস্তন কর্মচারীদের জানিয়ে দিচ্ছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। টেলিফোন রেখে অবনীমোহন বললেন, 'এই ভদ্রলোকের খুব খিদে পেয়েছে। কিছু আনানো যাবে?'

দারোগা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, নিশ্চয়ই। কি আনাবো? কচুরী তরকারী ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যাবে না এখন। তাই আনাই? আপনি খাবেন তো স্যার? খাবেন না? চা? অ্যাই কে আছ? গোটা ছয়েক কচুরি আর তিন কাপ চা নিয়ে এসো জলদি।'

একজন পুলিশ আদেশ পালন করতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দারোগা এবার হাত কচলালো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কোন অন্যায় হয়ে যায়নি তো? মানে নিজে এখানে এলেন!'

'না না। আমি এসেছি এর জন্যে। আচ্ছা, একে কি আপনি চিনতে পারছেন?'

দারোগা বলাই-এর দিকে তাকালেন। অবনীমোহন দেখলেন বলাই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দারোগা কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নেড়ে না বললেন। অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু আগে যে ফরেস্ট

বাংলোটার কথা ডি এফ ওকে বললাম সেখানে ইনি মাসখানেক থাকবেন। আমাদের কলকাতার একজন বড় নেতা চাইছেন এই সময়টা ওঁকে কেউ যেন বিরক্ত না করে।'

'ওটা তো আমার এলাকা নয় স্যার।'

'ওই এলাকার যিনি দারোগা তাঁকে তো আপনি চেনেন।'

'চিনি। তা আপনি কি ওখানে সেপাই পোস্ট করতে বলছেন?'

'না। ঠিক উল্টো। নেতা চাইছেন কেউ যেন ওঁর খোঁজ না করে।'

'ও। বুঝলাম। ঠিক আছে স্যার, হবে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

এত দ্রুত খাবার এসে যাবে কল্পনা করেননি অবনীমোহন। বলাই চেটেপুটে খেল! খেয়ে বলল, 'কচুরিতে যেন কেমন গন্ধ!,

দারোগা হাসল, 'মফস্বলের কচুরী তো। কলকাতার স্বাদ পাবেন কোথায়!'

চা খাওয়া হলে অবনীমোহন উঠছিলেন দারোগা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল, 'স্যার, এবার মন্ত্রী এলে আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

'মনে করিয়ে দেবেন।' অবনীমোহন বেরিয়ে এলেন থানা থেকে। তার পেছন পেছন বলাই। তার গলায় হাসি ছিল, 'বাপস। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। দিন, এবার মালটা দিন।'

ওটা আপনাকে এই জেলা থেকে চলে যাওয়ার দিন দেব।'

'সে কি? ওটা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।'

কান দিলেন না অবনীমোহন। বললেন, 'আপনাকে আমি বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিচ্ছি। বাস ওই ফরেস্টের পাশ দিয়ে যায়। কিছুটা হাঁটতে হবে। ততক্ষণে ডি এফ ও সাহেবের হুকুম পৌঁছে যাবে। আপনি চলে যান।'

'অ্যা? আমি একা যাব?' বলাই পাশে এসে দাঁড়াল, 'অসম্ভব। সত্যদা বলেছেন আপনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজে যেতে না পারেন কাউকে সঙ্গে দিন।'

'কাউকে সঙ্গে দিলে সে জানতে পারবে আপনার কথা।' মাথা

নাড়লেন অবনীমোহন। তাঁকে খুব বিষণ্ণ লাগছিল। এই লোকটিকে কেন তাঁকে বহন করতে হচ্ছে? কেন তিনি একে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না? সত্য দত্তর মুখ মনে পড়ল। বলাই অ্যাকশন করত। কি রকম কাজ সেটা তো তিনি এখনও জানেন না। এফ আই আর আছে যখন তখন—! না, তিনি একে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তা দলের কাউকেই জানানো চলবে না।

সামান্য হাঁটতেই বাসের দেখা পেলেন অবনীমোহন। হাত দেখাতেই সেটা থামল। কণ্ডাক্টর অবনীমোহনকে চিনতে পেরে উদ্যোগ নিয়ে জায়গা করে দিল। পাশাপাশি দুটো সিট। অবনীমোহন জানলার ধারে বসেই টিকিট কাটলেন। কণ্ডাক্টর নিতে চাইছিল না টাকা, তিনি বাধ্য করলেন। শহর ছাড়িয়ে বাস বাইরে বেরুলে অবনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার নামে এফ আই আর করা হয়েছে কেন?'

'ওই যে, তখন বললাম। অ্যাকশন করেছিলাম।' নিচু গলায় বলল বলাই।

'কি রকম অ্যাকশন?'

'অনেকগুলো।'

'যেমন?'

'ইলেকশনের সময় বুথ জ্যাম করতে বলা হয়েছিল। দলের লোকজন পারছিল না। তখন বোম নিয়ে রিভলভার নিয়ে নামলাম। সব ভোটার হাওয়া হয়ে গেল। বুথে ঢুকে কাজ শেষ করে চলে এলাম। কোন ঝামেলা হয়নি।'

'এ ছাড়া?' চোয়াল আবার শক্ত হল অবনীমোহনের।

'মাসখানেক আগে আমাদের পাশের পাড়ার কয়েকজন খুব গোলমাল পাকাচ্ছিল। কাটা পাঁচুর নাম শুনেছেন? শোনেননি? সত্যদা পাত্তা দেয়নি বলে এনিমি হয়ে গিয়েছিল। পুরো বস্তিটাকেই অ্যান্টি করে তুলেছিল। চোলাই, মেয়েছেলে সবরকম ব্যবসা করত।

একদিন অ্যাকশন করলাম। কাটা পাঁচুর প্রেমিকাকে ধরে রেপ করলাম। ব্যাস সব ঠাণ্ডা। পুরো বস্তি এখন আমাদের দলে। কাটা পাঁচু ভোগে।'

'ভোগে মানে?'

'লাইনে পড়ে আধাআধি টুকরো হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি রেপ করেছেন?' হতভম্ব অবনীমোহন।

'ওসব তো করতেই হয়। মেয়েছেলেটা আমার নাম পুলিশকে বলে দিয়েছে। ওকে ঠাণ্ডা করার টাইম পাইনি। ফিরে গিয়ে হিসেব নেব।'

'সত্য জানে আপনি এসব করেছেন?'

'গুরুর পারমিশন ছাড়া কোন কাজ করি না দাদা।'

অবনীমোহনের বমি পাচ্ছিল। বলাই-এর পাশে বসতে তার ঘেন্না হচ্ছিল। সত্য কাকে পাঠিয়েছে তার কাছে? একি তাদের ক্যাডার? সত্যর ক্যাডার? ক্যাডার মানে শিক্ষিত সৎ রাজনৈতিক কর্মী। তাহলে?

হঠাৎ অবনীমোহনের সমস্ত শরীরে জ্বলুনি ধরল। তিনি স্থির করলেন এই সামাজিক অপরাধীটিকে কোনরকম সাহায্য করবেন না। একে অবিলম্বে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। তারপরেই মনে হল পুলিশকে তিনি অন্যরকম অনুরোধ করে এসেছেন। বাড়িতে বসে এসব শুনলে কখনই সেটা করতেন না। এখন নতুন করে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তাহলে? অবনীমোহন ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করবেন? বাসবরা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে বলে। বাসব হলে কি করত? তিনি সরে বসলেন। কোন রকম রাস্তা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ফরেস্টের গেটের মুখে ওঁরা বাস থেকে নামলেন। বলাই বলল, 'যাঃ শালা! এখানে তো মানুষের মুখই দেখা যাবে না। সময় কাটবে কি করে?'

'মানুষের মুখ দেখার মত মুখ তো আপনি করেননি।' চাপা গলায় বললেন তিনি।

,মানে? কি উল্টোপাল্টা বলছেন?'

'ঠিকই বলছি। আমার বয়স হয়েছে। আর হাঁটতে পারব না। সোজা ওই কাঁচা রাস্তা ধরে চলে যান। বাংলো পাবেন। একমাসের মধ্যে এখান থেকে বের হবেন না।'

'আমি একা যাব?'

'এতদিন যা করেছেন তা কি একা করেননি?'

'না। সঙ্গী ছিল।'

'আমার কাজ আমি করেছি, যান।'

'মাল দিন। টাকা আর রিভলভার।'

বাস চলে গেছে। কয়েকমাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই। গাছে পাখি ডাকছে। হঠাৎ সচেতন হলেন অবনীমোহন। জীবনে কখনও রিভলভার চালাননি তিনি একটা পিঁপড়েকেও কখনও মারেননি। রিভলভার তাঁর পকেটে আছে। তাতে গুলি আছে বলেছিল বলাই। তিনি যদি এখন ওটা বের করে বলাই-র বুক লক্ষ্য করে ছোঁড়েন তাহলে কেউ টের পাবে না। আর এইটেই তাঁর কর্তব্য। একজন মানুষ হিসেবে, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলাই-এর মত পিশাচকে সরিয়ে দেওয়া একমাত্র কর্তব্য। তিনি রিভলভার বের করলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। বলাই এগিয়ে এসে রিভলভার নিয়ে নিল। তাঁর আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। বলাই ওটাকে পকেটে রেখে বলল, 'টাকাটা?'

'পকেটে একশটা টাকা ছিল, এটাই আপাতত রাখুন।' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'এতে আর কদিন চলবে? পাঠিয়ে দেবেন নইলে আমাকে আবার আপনার বাড়িতে যেতে হবে। সত্যদাকে খবরটা দিয়ে

দেবেন, দিতে বলেছে।' বলাই হেলতে দুলতে জঙ্গলের পথ ধরল। অবনীমোহনের মনে হল একটি জন্তুও ওর চেয়ে অনেক স্বাভাবিক পায়ে হাঁটে।

শহরে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। অস্নাত অভুক্ত অবনীমোহন বাড়িতে ঢুকে শুনলেন প্রচুর লোক তাঁর খোঁজে এসেছিল। সোমনাথরা যেতে বলেছে। তিনি দরজা বন্ধ করে তক্তাপোশে শুয়ে পড়লেন। মাথা ঘুরছে বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে। নন্দিনী একটু আগে ভেতরে চলে গেছে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাননি। হঠাৎ মনে পড়ল সকালে বলাই নন্দিনীর দিকে তাকিয়েছিল। যে বলাই প্রকাশ্যে রেপ করতে পারে, যে বলাই রেপের গল্প গর্বের সঙ্গে করতে পারে তাকে তিনি আশ্রয় দিয়ে এলেন। নন্দিনীর মুখ মনে পড়তেই তিনি শিউরে উঠলেন।

অনেকক্ষণ পরে অবনীমোহন উঠলেন। আলো জ্বাললেন। তারপর চিঠি লেখার কাগজ নিয়ে বসলেন। একটু ভেবে তিনি শুরু করলেন, 'শ্রীযুক্ত সত্য দত্ত প্রীতিভাজনেষু

—তোমার চিঠি নিয়ে বলাই আমার কাছে এসেছিল। প্রথমে থানায় নিয়ে গিয়ে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি। তারপর ডি এফ ও'র অনুমতি নিয়ে একটি ফরেস্ট বাংলোয় রেখে এসেছি। সেখানে যাওয়ার আগে আমি তার ক্রিয়াকলাপ জানতাম না।

আমি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। অনেক সংগ্রাম করে আজ আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এই পৌঁছানোটা মূল লক্ষ্যের সিকিভাগও নয়। আমরা চিরকাল জেনে এসেছি জনসাধারণের পাশে বন্ধু হিসেবে দাঁড়ানোটাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য। ঠিক যে কারণে আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক দলগুলো বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে কারণে উগ্রপন্থী বিপ্লবীরা হেরে গিয়েছে সেই কারণটা আমাদের যেন ধ্বংস না করে।

ক্ষমতায় আসার পর আমাদের আরও সুযোগ এসে গিয়েছে জনসাধারণের পাশে দাঁড়ানোর। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কয়েক কোটি মানুষকে তাঁবে আনতে আমরা কিছু পেশীশক্তির ওপর নির্ভর করছি। আজ যাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছ সে জনগণের শত্রু। অথচ তার ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। যতদিন তোমার হাতে ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কথা শুনবে। যেদিন প্রতিপক্ষের হাতে ক্ষমতা যাবে সেদিন সে দলবদল করে তোমার আমার স্ত্রী-কন্যাদের ধর্ষণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

এই সত্যটা আমাদের বোঝা উচিত। জনসাধারণের জন্যে কাজ করতে এসে তাদের শত্রু করে তোলার পথ থেকে এখনই আমাদের সরে আসা উচিত। এখন আমরা সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। কেউ সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু মনে করি। কিন্তু আমি মনে করি, আমার মত যারা বামপন্থী আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন তাঁরাও একমত হবেন, বর্তমান অবস্থায় আমরা সঠিক পথে চলছি না। আমাদের আত্মশুদ্ধি হওয়া দরকার। ঔদ্ধত্য ত্যাগ করা উচিত। আর এই সমাজবিরোধীদের উৎখাত করে সামাজিক তরুণদের ওপর আস্থা রাখা প্রয়োজন।

আজ সকালে বাসবের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সে আমাকে বর্তমানের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলেছিল। আমিও তোমাদের জীবনের সঙ্গে পা মেলাতে অনুরোধ করছি। তোমার কাছে অনুরোধ, তুমি বলাইকে পুলিশের হাতে তুলে দাও। এই শহরের দারোগা জানে সে কোথায় আছে। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধর যাতে মানুষ জানবে আমরা অপরাধীর রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে হাত মেলাইনি।

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এইটুকু আমার আবেদন।
অবনীমোহন।'

চিঠিটা ভাঁজ করলেন তিনি। খামে ঢোকালেন। তারপর

ধীরে ধীরে ভেতরের দরজা খুলে অন্ধকারেই বাথরুমে ঢুকলেন। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল স্নান করার। জলের ধারায় নিজেকে ধুয়ে নিতে। কিন্তু কল পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি। শব্দ শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এল। চিৎকার চেঁচামেচি। অ্যাম্বুলেন্স এল হাসপাতালে নিয়ে যেতে। সারা শহরে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন অবনীমোহন। তাঁর মাথার পাশে বসে নন্দিনী আকুল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ দাদু?'

অবনীমোহন জড়ানো গলায় বললেন, 'চিঠি—টে-বিলে!'

'তুমি চিঠি লিখেছ, কাকে পাঠাবো?'

অবনীমোহন চেষ্টা করলেন। কথা বেরুলো না ঠোঁট থেকে। এক হাত অসাড়। অন্য হাতে তিনি যেন এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তের ঠিকানা আঁকলেন।

৬

রাত ৯টায় রাতের খাবার শেষ করেন নির্মলেন্দু। টেবিলের ওপাশে স্ত্রী বসে থাকেন চুপচাপ। খাওয়া শেষ হলে দশ মিনিট ছাদে হেঁটে এসে বিছানায় চলে যান। আজ একটু অন্যরকম হল। স্ত্রী বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

নির্মলেন্দু ওষুধ কোম্পানীর জাঁদরেল সাহেব ছিলেন। ছয়মাস আগে অবসর নিয়েছেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। স্ত্রী কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'রোজ সিনেমায় না গেলেই কি নয়?'

নির্মলেন্দু সোজা হলেন। খানিক চোখ বন্ধ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার কে বলল?'

'ছোটখোকা।' স্ত্রী নিচু গলায় জানালেন।

'হুম।' উঠে গেলেন নির্মলেন্দু। হাতমুখ ধুয়ে সোজা অন্ধকার ছাদে। এখনও ছেলেরা বাড়ি ফেরেনি। সল্টলেকের এই বাড়ি তারই টাকায় তৈরি। বড় ছেলের স্ত্রী এই বাড়িতে থাকতে চাননা। কিন্তু তাঁর স্বামীর জন্য সেটা পারছেন না। ছোট ছেলে এখনও বিয়ে করেনি। করলে একই অবস্থা হতে পারে।

এখন প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃভ্রমণে যান নির্মলেন্দু। সাদাকেডস্ এবং শর্টসগেঞ্জি পরে। ফিরে এসে চা খান, কাগজ পড়েন এবং বাথরুমে ঢোকেন। দাড়ি কামানো স্নান সেরে এসে একেবারে তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে যান। ঠিক নটা নাগাদ পুরোদস্তুর পোষাক পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ফেরেন ঠিক ছটায়। বাড়ি ফিরে পরিস্কার হয়ে এক কাপ চা আর সামান্যকিছু খেয়ে বই নিয়ে বসেন। রাত নটায় রাতের খাবার। স্ত্রী বলেছিলেন অবসর নেবার পর নিত্যদিন এভাবে বেরুনো কেন? তিনি কি নতুন করে কোথাও চাকরি নিয়েছেন? জবাব দেননি নির্মলেন্দু। চাকরি যতদিন ছিল ততদিন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করার সাহস স্ত্রীর ছিল না।

আগে অফিসের গাড়ি আসতো দরজায়। এখন হেঁটে টার্মিনাসে যান। প্রয়োজন হলে দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে লাইনে দাঁড়ান সিট পাবার জন্যে। ডালহৌসিতে নেমে ধীরে ধীরে ফুটপাত ধরে চক্কর মারেন কয়েকটা। এতবছর এপাড়ায় এসেছেন কিন্তু ডালহৌসিটাই ভাল করে দেখার সুযোগ পাননি। এখন দেখছেন। ফুটপাতে মানুষ হাঁটতে পারে না। এত ভাঙ্গাচোরা, নোংরা জানা ছিলনা। রাজভবনের দিকটায় তবু হাঁটা যায়। এগারটা নাগাদ তিনি ইডেনগার্ডেনে পেঁছে যেতেন। সেখানে বসে থাকতেন ঠিক পাঁচটা পর্যন্ত। সেই ছেলেবেলায় তিনি ইডেনে আসতেন মিলিটারিদের ব্যাণ্ড শুনতে। আর আসা হয়নি। প্যাগোডার কি দুরাবস্থা।

তবু গাছপালার মধ্যে বসে থাকাটা খুব খারাপ লাগত না। আশে পাশের গাছতলায় রোজ নতুন নতুন প্রেমিক প্রেমিকার ভিড়। সবাই নিম্ন অথবা মধ্যবিত্ত। স্কুলের মেয়েও আছে। প্রথম প্রথম খুব রাগ হত। একটা সকাল এগারটা থেকে সমানে প্রেম করে গেলে দেশ তাদের কাছে কি পাবে? শেষ পর্যন্ত এসব উপেক্ষা করেছিলেন। তখন ঘুম আসত। ঘুমালে সময় দিব্যি চলে যেত।

এক রাত্রে স্ত্রী বললেন, 'বড় খোকা খুব রাগ করছিল।'

'কেন? তার আবার কি হল?'

'তুমি দুপুরে ইডেন গার্ডেনে গিয়েছিলে?'

হকচকিয়ে গিয়েছিলেন নির্মলেন্দু। উত্তরের অপেক্ষা না করে স্ত্রী বলে গেলেন, 'ওর অফিসের লোকজন কি সব সার্ভে করার জন্য ওখানে গিয়েছিল। তাদের একজন তোমাকে চিনতে পারে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে বলে ডাকেনি। বড় খোকা বলছিল, কাজকর্ম নেই যখন তখন বাড়িতেই ঘুমালে ভাল হয়।'

চোয়াল শক্ত হয়েছিল নির্মলেন্দুর কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। তবে রোজ বেড়িয়ে যাওয়ার পিছনে যে রহস্য ছিল তা এদের কাছে পরিস্কার হয়ে যাওয়াতে একটু খারাপ লেগেছিল। কিন্তু পরের দিনও তিনি ঠিক নটায় সেজে গুজে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। হাঁটাহাটি করে মেট্রো সিনেমায় দুপুরের ছবি দেখে সময় কাটালেন ভালভাবে। কিন্তু কি ছবি? চোখ খোলা রাখতে ইচ্ছে করছিল না। তবে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে চিনে ফেলবে কেউ এমন সম্ভাবনা নেই বলে প্রতিদিন বাড়ি ফেরার আগে ধর্মতলা অঞ্চলের সমস্ত সিনেমার নুন এবং ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট আগাম কেটে ফেলতে লাগলেন।

একবার না জেনে কাটার ফলে সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহের তামিল ছবিতেও গিয়েছিলেন তিনি তবে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে ছবি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়না। তখন ছবি সামনে নেই আর শব্দ ধীরে

ধীরে কান থেকে সরিয়ে ফেললেই চমৎকার ঘুম। শুধু সতর্ক থাকতে হয় যাতে পাশের লোক সেটা বুঝতে না পারে। দুবার এই অবস্থায় তাঁকে কিঞ্চিত কথা শুনতে হয়েছে। কি মশাই, টিকিট কেটে হলে এসে ঘুমাচ্ছেন?

আজ ছাদে পায়চারি করতে করতে ঠোঁট কামড়ালেন নির্মলেন্দু। ওরা কি খুব হাসাহাসি করছে এই নিয়ে? তিনি যে সিনেমায় গিয়েছেন তা ছোট খোকা জানল কি করে? কাজ ফেলে সেও যাচ্ছে নাকি? ওই বয়সের ছেলেদের বেলা বারোটার শোয়ে তিনি দেখেছেন বটে কিন্তু তাঁর ছেলে-? স্ত্রী বললেন রোজ রোজ না গেলে নয়? রোজ যে যাচ্ছেন এই তথ্য কোথায় পেল ওরা।

পরদিন ঠিক নটায় বের হলেন নির্মলেন্দু। বেরুবার আগে মনে হচ্ছিল প্রথমে স্ত্রী পরে ছোটখোকা তাঁকে কিছু বলবে। কিন্তু তিনি মোটেই আমল দিলেন না। গম্ভীর মুখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টার্মিনাসে চলে এলেন। এবং সেখানে হরিপদবাবুর সঙ্গে দেখা। খুব বিচলিত অবস্থা ভদ্রলোকের। পাড়ার লোকদের সঙ্গে এতকাল নিরাপদ দূরত্ব রাখতেন তিনি। রাসভারী অফিসার হিসেবে সবাই তাঁকে জানে। তবু হরিপদবাবু কথা বললেন, 'রায়সাহেব, আপনার সঙ্গে কি মেডিক্যাল কলেজের কারো চেনা আছে?'

'মেডিক্যাল কলেজ? কেন?' অবাক হলেন নির্মলেন্দু।

'আর বলবেন না, আমার ভাই ওখানে কাল রাত্রে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক, মাঝ রাতে, ভোরে জেনে এসেছি এমার্জেন্সিতে ফেলে রেখেছে, বললে কোন বেড খালি নেই, কি যে করি!' হরিপদবাবু বিচলিত।

মনে মনে মেডিক্যাল কলেজের কাউকে খুঁজে পেলেন না নির্মলেন্দু। হ্যাঁ, বেলভিউ বা ক্যালকাটা হসপিটাল হলে এখনই দু'দশটা নাম বলে দিতে পারতেন। তাঁর পর্যায়ের অফিসারদের ওসব জায়গায় ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। হরিপদবাবুর

দিকে তাকালেন তিনি। ওষুধ কোম্পানীর বড়কর্তা হিসেবে অনেক বিখ্যাত ডাক্তারকে তিনি চিনতেন। বললেন, 'চলুন দেখি'।

হরিপদবাবু অবাক, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'আপনি বিপদে পড়েছেন, তাই না?'

আজ রুট বদল করতে হবে। পকেটে নুন শোয়ের টিকিট যা তিনি অ্যাডভান্স কেটেছিলেন, মেডিক্যাল কলেজের সামনে নামতে প্রচণ্ড কষ্ট হল। এত ভীড় ঠেলে গুঁতোগুঁতি করে কখনও নামেননি তিনি। হরিপদবাবু বারংবার বলছিলেন তাঁর জন্যে নির্মলেন্দুর খুব কষ্ট হচ্ছে। নির্মলেন্দু কিছু বললেন না।

ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে নির্মলেন্দু হতবাক। এই নোংরা পরিবেশে প্যাসেজের মধ্যে পাশাপাশি কিছু অসুস্থ মানুষকে ফেলে রেখেছে ওরা। একটি স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা! সারা জীবন আয়কর দেওয়া একটা লোক এখানে এসে সরকারের কাছ থেকে একটু ভাল পরিবেশ আশা করতে পারে না? হরিপদ-বাবুর ভাইয়ের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা হাওয়া করছেন। সম্ভবত স্ত্রী! কাতর গলায় বললো সকালে বড় ডাক্তার রাউন্ডে এসে একবার দেখে গিয়েছেন কিন্তু চিকিৎসা তেমনভাবে শুরু হয়নি। নির্মলেন্দু বুঝলেন এদের লোকবলও নেই। ঠিক তিন হাত দূরে শোওয়া এক রুগী এমনভাবে ককিয়ে উঠল যে তিনি প্রায় ছিটকেই বাইরে চলে এলেন।

রুমালে ঘাড় মুছলেন নির্মলেন্দু। দরিদ্র মানুষেরা তাদের আত্মীয়দের সুস্থ করতে এসে ভিড় জমিয়েছেন চারপাশে। কি করা যায়? নির্মলেন্দু হাঁটতে হাঁটতে একটা বোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকলেন। দুজন বসেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কোন বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে কি করতে হয়? একজন ভেতরের দরজা দেখালো, 'ওখানে আর পি আছেন। চলে যান।'

নির্মলেন্দু সেই দরজায় পৌঁছে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন, 'ভেতরে আসতে পারি?'

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আর একজনকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়লেন। নির্মলেন্দু ভেতরে ঢুকে বললেন, 'আমি নির্মলেন্দু রায়। কিছুদিন আগেও চাকরি করতাম। এখন অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক। আপনি?'

'আমি এই হাসপাতালের রেসিডেন্সিয়াল ফিজিসিয়ান। কোন সমস্যা থাকলে বলতে পারেন। বলুন।'

'গুড। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের ভাই গত রাত্রে অসুস্থ হয়ে এই নরকে পড়ে আছেন। তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি?'

আর পি হাসলেন, 'সুচিকিৎসা নিশ্চয়ই করা হবে বা হচ্ছে। তবে আপনি যাকে নরক বললেন সেটাকে স্বর্গে পরিণত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যখন সমস্ত দেশ এই শহরটা বিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তখন আমার একার চেষ্টায় হাসপাতালে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।'

'বাট ইউ আর পেইড ফর দ্যাট।'

'ঠিকই। কিন্তু দশটা সিটের হাসপাতালে যদি একশটা রুগী আসেন তাহলে হয় নব্বুইজনকে ফিরিয়ে দিতে হয় নয় তাঁদের চিকিৎসার সুবিধে দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা মানতে হয়। যারা এখানে কাজ করেন তারা যদি মনে করেন অন্য পাঁচটা সরকারী চাকরির সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই তাহলে পরিবেশের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কি হয়েছে আপনার পেশেন্টের?'

'শুনলাম হার্ট এ্যাটাক হয়েছে।'

আর পি উঠলেন। নির্মলেন্দুকে নিয়ে সোজা পৌঁছে গেলেন হরিপদবাবুর ভাই-এর কাছে। পরীক্ষা করলেন। তারপর একটু এগিয়ে আর একটা ঘরে পৌঁছে হাউস সার্জেনকে ডেকে প্রশ্ন

করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নির্মলেন্দুকে বললেন, 'আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না। আমাদের কাছে যথেষ্ট ওষুধপত্র আছে। যদি অন্য কিছু পরীক্ষার দরকার হয় তবে আপনারা তাতে সাহায্য করবেন। হাসপাতালেও ব্যবস্থা আছে কিন্তু আনঅফিসিয়ালি করলে ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া যাবে। আর পেশেন্টের যা কণ্ডিশন তাতে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয়। একটু ভাল বুঝলে বেডের কথা ভাবা যাবে। নমস্কার।' আর পি চলে গেলেন।

হরিপদবাবু সব শুনছিলেন। এবার গদগদ গলায় বললেন, উঃ, তবু স্যার আপনার জন্যে এসব শুনতে পেলাম। আমি তো থৈ পাচ্ছিলাম না।'

সারাটা দিন হরিপদবাবুর ভাইকে নিয়ে কেটে গেল। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় সাহায্য করতে প্রচুর উৎসাহ দরকার। নির্মলেন্দু সেটা দেখালেন। এবং এরই মধ্যে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যাঁর স্ত্রী এমার্জেন্সিতে ভর্তি হয়েছেন সাতদিন জ্বরে ভুগে। বুকে নিমোনিয়া হয়েছে। লোকবল নেই। ডাক্তার তাঁর রক্তপরীক্ষা করতে দিয়েছেন। তিনি সেটা জমা দিতে তালতলায় গেলে রুগী একা পড়ে থাকবেন। নির্মলেন্দু আগবাড়িয়ে সেটা নিয়ে ছুটলেন। বিকেলে দুই রুগী নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি। দেখা গেল দুটি পরিবারের সঙ্গে একদিনেই ঘনিষ্ঠ হয় পড়েছেন নির্মলেন্দু। বিকেলে আত্মীয়াকে দেখতে আসা ভিজিটররা তাকেই প্রশ্ন করছেন অসুস্থতা সম্পর্কে। সারাটা দিন বেশ উন্মাদনার সঙ্গে কেটে গেল। ক্রমশঃ মেডিক্যাল কলেজের নোংরা পরিবেশ অভ্যেসে এসে যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন এখানকার হাউস সার্জেন, ডাক্তার পেশেন্ট নিয়ে খুব ভাবেন। একটি দাড়িওয়ালা হাউস সার্জেনের কাজ দেখে তিনি তো মুগ্ধ।

আজ বাড়িতে ফিরতে দেরি হল। গম্ভীর মুখে বাথরুমে ঢুকে

গেলেন তিনি। স্নান করলেন! খুব ক্লান্ত লাগছিল। কাল ওই ভদ্রমহিলার রিপোর্ট পাওয়া যাবে। সকালে সরাসরি তালতলায় চলে যাবেন তিনি রিপোর্ট নিতে। একটা বাচ্চা ছেলে ভর্তি হয়েছে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কেসটা কি?

রাত্রে খাবার খেতে বসলেন তিনি। স্ত্রী সামনে। এইসময় হরিপদবাবু এলেন। স্ত্রী উঠে গেলেন। ফিরে এসে জানালেন, 'হরিপদবাবু এসেছেন। ও'র ভাইকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গিয়েছে বললেন।'

'উনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?' নির্মলেন্দু জানতে চাইলেন।'

'না। কি ব্যাপার?'

নির্মলেন্দু অনেকদিন বাদে হাসলেন, 'তোমার খোকারা এখন থেকে আর আমার ঠিকানা খুঁজে পাবেনা! দিন কাটাবার চমৎকার উপায় খুঁজে পেয়েছি আমি। বুঝলে?'

৭

রাপদ বসুকে এই কাহিনীর নায়ক বলা যাবে না। অথচ যা কিছু ঝামেলা ওকে নিয়েই। নিরাপদ অবশ্য ঝামেলা বলে স্বীকার করে না। সে যথেষ্ট ঝামেলা-এড়ানো ভদ্রলোক। ওর স্ত্রী হৈমন্তী যদিও এই স্বভাবটার জন্যে ওকে ব্যক্তিত্বহীন মানুষ বলে মনে করে। নিরাপদ এসব শুনতে দুঃখ পায়। কিন্তু ইদানিং স্ত্রীর কথাবার্তা সে উপেক্ষা করতে শিখে গিয়েছে। নিরাপদ একজন সরকারী চাকুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া হিসেবে ফল ভাল করেছিল। চাকরিতে ফাঁকি দেয়নি। তাই পঞ্চাশ বছরেই যতটা ওপর তলায় ওঠা সম্ভব উঠেছে।

হৈমন্তী খুব গোছানো মেয়ে। স্বামীর যা আয় তাতেই সে সংসারটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। চাহিদা তো অনেক থাকে কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে দিনরাত অশান্তি করে না। চল্লিশের এপারে এসেও হৈমন্তী এখনও আকর্ষণীয়া, যাকে বলে সুন্দরী, ঠিক তাই। আর এখানেই তার যা কিছু কষ্ট। নিরাপদ পঞ্চাশেই কেমন বুড়ো বুড়ো হয়ে গিয়েছে। অফিস আর বাড়ী ছাড়া কিছুতেই উৎসাহ নেই। সুন্দরী স্ত্রী যে তাকে তেমন আকর্ষণ করে তা আর আজকাল বোঝা যায় না। হৈমন্তী-নিরাপদের মেয়ের নাম অদিতি। বয়স আঠারো উনিশের মাঝামাঝি লম্বা, দারুণ দেখতে, ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় হৈমন্তীর রাত্রের ঘুম নেই। টেলিফোন বাজলেই অতিদিকে কেউ না কেউ ডাকবে। লেটার বক্সে প্রেমপত্রের বন্যা বয়ে যায়।

ভরসা এই মেয়েটা এসব পাত্তা দেয় না। হৈমন্তীর রাগ, নিরাপদ একটুও চিন্তিত নয় মেয়ের ব্যাপারে! কখন কোন উটকো ছেলের সঙ্গে মজে গেলে সারাজীবন কপাল চাপড়াতে হবে। সারা সময় মেয়েকে সেকথা শোনায় হৈমন্তী।

এই নিরাপদকে অফিসের কাজে একবার দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। দিল্লীতে হৈমন্তীর দিদি থাকেন। কোন অসুবিধে হয়নি। ফেরার সময় কালকার টিকিট পাওয়া গেল না। সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারে সে বেশী স্বচ্ছন্দ। ভায়রাভাই রাজধানীর চেয়ার-কারের টিকিট ম্যানেজ করে দিল। বড়লোকী পরিবেশ একদম সহ্য হয় না নিরাপদর। এয়ার কণ্ডিশণ্ড মানে সেই রকম ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সিটে বসে দেখল তার মত পোশাক ও চেহারার অনেক যাত্রী আছে। সে ব্যাগ থেকে আগাথা ক্রিষ্টির একটা বই বের করে চোখ রাখল হেলানো চেয়ারে মাথা রেখে। আগাথা ক্রি!ট ওর খুব প্রিয় লেখিকা। গাড়ী চলল। ভেতর থেকে গতি বোঝার উপায় নেই, ধুলো নেই। নিরাপদর ভাল

লাগল। এই সময় বেয়ারা গোছের একটি লোক এসে সামনে দাঁড়িয়ে সেলাম করল! চমকে উঠে বসল নিরাপদ। তারপর লোকটিকে লক্ষ্য করে বুঝল সেলামটা তার পাশে বসা যাত্রীর জন্যে।

বেয়ারা খুব বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব্, কফি চাহিয়ে?'

'কফি? হোলে মন্দ হয় না।'

'ঠিক হ্যায় সাব।' বেয়ারা চলে গেল।

নিরাপদ অবাক। কম্পার্টমেন্টের কাউকে এই প্রশ্ন করেনি বেয়ারা। এই লোকটি কি এমন তালেবর যে তাকেই খাতির করতে হবে। কিন্তু এই প্রশ্ন মনে এলেও মুখে কিছু বলল না নিরাপদ। সেটা তার স্বভাবে নেই। নিজেকেই বোঝাল, নিশ্চয়ই রেলের কোন বড় কর্মচারী। সে আড়চোখে তাকাল। বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। রোগা, ফর্সা, চশমা পরা। এধরণের চেহারার বয়স চট করে অবশ্য আন্দাজ করা যায় না।

কফি এল। আরাম করে খেলো লোকটা পাশে বসে।

কম্পার্টমেন্টের অনেকেই এই খাওয়াটা দেখছে। সবার চোখেই বিস্ময়।

পাশাপাশি বসেও কথা হচ্ছিল না। আগ বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব নেই নিরাপদর। সে বই-এ দৃষ্টি রেখেছিল। বেয়ারাটা আবার এল কাপ প্লেট নিতে। জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, আপনি কি আলাদা কোন মেনু ডিনার নেবেন?'

লোকটি বলল, 'না, না। যা সবাইকে দিচ্ছ তাই আমাকে দিও।'

নিরাপদ নিশ্চিত হল লোকটি রেলের অফিসার। তার অবশ্য রেলের অফিসারের সঙ্গে আলাপ রাখার প্রয়োজন নেই। কালেভদ্রে কলকাতা থেকে সে বের হয়।

'ওটা কি আগাথা ক্রিস্টি?'

চমকে উঠল নিরাপদ। দ্রুত মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আমার খুব প্রিয় লেখক। কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি থেকে আমাদের ফেলুদা হাতে পেলে পৃথিবী ভুলে যাই আমি।'

নিরাপদ হাসল। অথবা বলা যেতে পারে, হাসবার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'দিল্লীর লোক নন নিশ্চয়ই ?'

'না, না, আমি কলকাতায় থাকি। কাজে এসেছিলাম।

সরকারি কাজে।'

'প্রায়ই আসেন ?'

'না। হঠাৎই আমাকে আসতে হল।'

'কোন ডিপার্টমেণ্ট আপনার ?'

নিরাপদ সেটা জানাল। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'যাক খুব দুশ্চিন্তা ছিল, আমার পাশে যদি কোন উটকো লোক বসত তাহলে সারাটা পথ মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে হত আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না !'

'আমি নিরাপদ বসু। আপনি ?'

'অম্লান মিত্র।'

ভদ্রলোক কি করেন, রেলের অফিসার কিনা তা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ হচ্ছিল নিরাপদর। নিজের ওপর এই কারণেই তার ক্ষোভ হয়। হৈমন্তী রেগে যায় এই কারণে। ডিনার এল। ভদ্রলোক বেয়ারাকে বললেন খাবার দেওয়ার আধ-ঘণ্টা বাদে আবার যেন কফি দিয়ে যায়। এবার দুকাপ।

না, লোকটা খারাপ নয়। রাত্রে ঘুমবার আগে অনেক কথা হল। সকালেও। নিরাপদর অফিস এবং বাড়ির ফোন নম্বর নিলেন ভদ্রলোক। নিজের ফোন নম্বর দিলেন না। বললেন, টালিগঞ্জের নাম্বার শুনছি পাল্টে যাবে। গিয়ে দেখব হয়তো এরই মধ্যে পাল্টে গিয়েছে। আপনাকে জানিয়ে দেব।'

এই লোকটির কথা বাড়িতে ফিরে হৈমন্তীকে বলেনি নিরাপদ। বললেই হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করত, 'একটা লোককে সব জানিয়ে দিলে

অথচ সে কি করে কোথায় থাকে তা জানলে না?' খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু নিরাপদ বোঝাতে পারবে না যে তার মনে হয়েছিল লোকটি নিজের সম্পর্কে বেশী কথা বলতে চায় না। তাই জিজ্ঞাসা করতে তার ভদ্রতায় লেগেছিল। তাছাড়া একজনের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছে এবং সেখানেই শেষ, তাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা করে কি হবে। হৈমন্তীকে একথা বলা মানে ঝামেলা পাকানো। হৈমন্তীকে খুসী করার জন্যে ও রোজ সকালে বাজারে যায়, গ্যাস বুক করে, তাগাদা দেয়, রেশনের দোকানে যায়, শুধু কেরাসিনের লাইন দেয় না। সেটা হৈমন্তীই নিষেধ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বস্তির লোকদের সঙ্গে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে চায় না সে। কিন্তু ইলেকট্রিক বা টেলিফোনের বিলটা ওর পকেটে গুঁজে দেয়। ডাবল সিলিন্ডার থাকায় গ্যাস ফুরাবার আগেই দ্বিতীয় সিলিন্ডার পাওয়া যায়। হৈমন্তীর সমস্যা থাকে না। এবার দিল্লী থেকে এসে শুনল যে কোন মুহূর্তে আগের গ্যাস শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দোকানে বলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সিলিণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে না। বলছে সাপ্লাই নেই। পাড়ার দোকানে গ্যাস সাপ্লাই না থাকলে নিরাপদ কি করতে পারে? হৈমন্তী অবশ্য কাজের মেয়েকে দিয়ে অনেকটা কেরাসিন তুলিয়ে রেখেছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে নিরাপদ দেখল লোডশেডিং। মেজাজ খারাপ হয় না আজকাল। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম প্রথম ফোন করত অদিতির তাড়নায়। শুনত কেবল ফল্ট। আজকাল করে না। মোমবাতি জ্বলে, গরমে পচতে হয়। আজ টেলিফোন বাজল। হৈমন্তী কথা বলে জানাল অম্লান মিত্র নামে একজন তাকে ডাকছে।

নিরাপদ ফোন ধরল। অম্লানের গলা পাওয়া গেল, 'কি মশাই, চিনতে পারছেন? আমি অম্লান। রাজধানীতে আলাপ হয়েছিল।'

নিরাপদ শুকনো হাসল, 'হেঁ হেঁ।' কেমন আছেন।'

'ফার্স্ট ক্লাশ। আপনাদের পাড়ায় এসেছিলাম। ভাবলাম যোগাযোগ করি। কি করছেন?'

'কিছু না।'

'তাহলে একবার আপনাদের ওখানে ঢু মেরে আসি।

ঠিক কোথায় যেন বাড়িটা?'

নিরাপদ মোটামুটি বুঝিয়ে দিল।

টেলিফোন রেখে সে কিন্তু কিন্তু করে হৈমন্তীকে বলল, অম্লানবাবুর সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। খুব বড় অফিসার।'

'কোথাকার?'

'রেলের বোধহয়।'

'বোধহয় মানে? উনি বলেন নি?'

নিরাপদ অস্বস্তিতে পড়ল, 'সেই রকম মনে হল।'

'আশ্চর্য! একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল, টেলিফোন নাম্বার দিলে অথচ সে কোথায় কাজ করে জানলে না! কি করে সরকারি চাকরি কর? কি বললেন?'

'এ পাড়ায় এসেছিলেন। তাই ঘুরে যেতে পারেন।'

'এই অন্ধকারে? নিষেধ করলে না?'

'কেউ যদি আসতে চায় নিজে থেকে তো মানা করব কি করে?'

'আমি লোডশেডিং-এর মধ্যে চা ফা খাওয়াতে পারব না।'

মিনিট দশেক বাদে অম্লান এল। এসেই বলল, 'একি দাদা, অন্ধকারে বসে আছেন?'

নিরাপদ বলল, 'কি করব, উপায় তো নেই।'

'উপায় নেই হয় নাকি? আপনার টেলিফোন কোথায়?'

নিরাপদ অবাক হলেও টেলিফোন দেখিয়ে দিল। মোমবাতির আলোয় ডায়াল ঘোরাল অম্লান। নিরাপদ শুনল অম্লান বলছে, 'হেলো, চিফ ইঞ্জিনীয়ার আছেন? ও, অম্লান বলছি। আমি এখন তিনশো বাইশ সার্কুলার রোডে আছি। এখানকার ফেজটা অন করে দিতে বলুন। ধন্যবাদ।' রিসিভার রেখে দিয়ে অম্লান বলল, "এই গরমে কোন ভদ্রলোক থাকতে পারে?

নিরাপদ অবাক। সে একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেল যখন এর মিনিটখানেক বাদেই আলো এসে গেল। চার পাশে উল্লাস শোনা গেল। ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তী সমস্ত ব্যাপারটা শুনল। আলো জ্বলতে সেও অবাক। নিরাপদ না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাইতে আপার চেনাজানা আছে বুঝি?'

'ওই একটু আধটু।' অম্লান বসল। এই সময় অদিতি ছুটে এসে জানাল একমাত্র তাদের বাড়ি এবং রাস্তার এপাশের কয়েকটিতে আলো এসেছে। উল্টোদিকটায় এখনও লোডশেডিং। অম্লান অদিতিকে দেখছিল। হেসে বলল, 'যাতে তোমাদের এই বাড়িতে কখনও লোডশেডিং না হয় সেই ব্যবস্থা করবো?'

'আপনি পারবেন? অসম্ভব।'

'দেখি।' রহস্যের হাসি হাসল অম্লান।

নিরাপদ স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে অম্লানের আলাপ করিয়ে দিল। অম্লান খুবই ভদ্রভাবে কথা বলল। অদিতি টিভি খুলেছিল। ছবি এখনও কাঁপছে। দুবছরের টিভি, মিস্ত্রি দেখিয়েও ঠিক হচ্ছে না। অম্লান বলল, 'এই টিভি দেখবেন না দাদা, চোখ খারাপ হয়ে যাবে।'

হৈমন্তী বলল, 'কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না গ্যারাণ্টি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর কয়েকবার মিস্ত্রি দেখালাম, যখন করে দিয়ে যায় তখন ঠিক থাকে তারপর যাকে সেই। আর একটা যে কালার টিভি কিনব তার তো উপায় নেই। যা দাম।

'আহা কিনবেন কেন বউদি।' দুবছর তো বেশীদিন নয়। কোম্পানিকে লিখছেন না কেন? ঠিক আছে, টিভি কেনার রসিদটা আছে? অম্লান জিজ্ঞাসা করল।

রসিদ পাওয়া গেল। সে সেটা পকেটে রেখে বলল, 'এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দেখি কি করা যায়।'

অনেকক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে চলে গেল সে। এর মধ্যে হৈমন্তী জানতে পেরেছে বিয়ে থা করার সুযোগ হয়নি এখনও ওর। টালিগঞ্জে বাড়ি। বাড়িতে মা আছে। সরকারি চাকরি করে। কিন্তু কোন ডিপার্টমেণ্ট তা বের করতে পারে নি হৈমন্তী। অম্লান বলেছে, 'বউদি মাপ করবেন, এটা বলতে অসুবিধে আছে।'

তাজ্জব ব্যাপার। সেদিনের পর আর লোডশেডিং হচ্ছে না এ

বাড়িতে প্রতিবেশীরা এতে অবাক। ঈর্ষান্বিত অনেকেই। হৈমন্তী বলল, 'সত্যি ভদ্রলোক খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল।'

হৈমন্তীর ভাই এসেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন করে। বলল, 'সত্যি দিদি, এই কারণে তোমরা এত সহজে টুপি পরো।'

হৈমন্তী চটে গেল, 'আজে বাজে কথা বলিস না।'

ভাই বোঝাল, 'ধরো, আমার সঙ্গে খুব জানপয়চান আছে ইলেকট্রিসিটির ইঞ্জিনিয়ারের। এপাড়া এসে জানলাম তোমার বাড়িতে লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে তাকে অনুরোধটা করলাম। তারপর তোমার বাড়িতে এসে যেন প্রথম লোডশেডিং দেখছি এমন অভিনয় করে লোকটাকে দ্বিতীয়বার ফোন করলাম। ব্যাস, আলো এসে গেল। আর তুমি ভাবলে, বাপস, লোকটার কি ক্ষমতা।'

হৈমন্তী এতটা বোঝেনি। এবার বুঝে বলল, 'যাক বাবা, আমাদের তো আর লোডশেডিং হচ্ছে না, সেইটেই উপকার।'

কিন্তু দিন তিনেক বাদে টিভি কোম্পানি থেকে টেলিফোন এল। তাঁরা পুরোন টিভি ফিরিয়ে নিয়ে নতুন সেট দিয়ে দিতে চান। আজ বিকেলে তাঁদের লোক সেটা পৌঁছে দেবে। হৈমন্তী হতভম্ব। গ্যারাণ্টি কার্ডে এক বছর সময়সীমা ছিল তবু এটা সম্ভব হল কি করে? সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল নিরাপদকে। নিরাপদ ছুটে এল বাড়িতে। কোম্পানির লোক বিকেলবেলায় এসে পুরোন সেট নিয়ে গেল নতুন সেট বসিয়ে। তারা জানাল ওপরতলার হুকুমে কাজটা করা হচ্ছে। নতুন সেট অনেক বেশী আধুনিক এবং দামের তফাৎ তিন হাজার টাকা।

হৈমন্তী বলল, 'নাঃ, ক্ষমতা আছে বটে অম্লানের। তবে গায়ে পড়ে এত উপকার করছে, এটা আমার ভাল লাগছে না।'

নিরাপদ বলল, 'তুমি বড্ড সন্দেহবাতিক।'

'হয়তো। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছে না।'

তাহলেও আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপারটা জানল। অনেকেই অম্লানের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। হৈমন্তী ঠেকিয়ে রাখে। দিন দশেক বাদে ছুটির দশ মিনিট আগে নিরাপদ দেখল তার সামনে অম্লান, 'এদিকে এসেছিলাম ভাবলাম দাদাকে নিশ্চয়ই অফিসে পেয়ে যাব।'

নিরাপদ টিভিটার জন্যে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

অম্লান বলল, 'এ কিছু নয়। আসলে আমরা অনেকেই নিয়ম জানি না। কোন কোম্পানি চাইবে না বিক্রির দুই বছরের মধ্যে তাদের জিনিষ খারাপ এটা বাজারে চালু হোক। নিজেদের মান বাঁচাতে ওরা পাল্টে দেবে।'

নিরাপদ অম্লানের সঙ্গে বের হল। সামনের গাড়িতে তাকে নিয়ে উঠল অম্লান। গাড়ির ওপর লাল আলো। ড্রাইভার নেই। অম্লানই চালান। ডালহৌসি এলাকায় অত স্পীডে গাড়ি চালাতে দ্যাখেনি নিরাপদ। মাথার ওপর লাল আলো থাকায় মোড় পার হবার সময় সেপাইরা সেলাম ঠুকছে।

নিরাপদ বাকশক্তি রহিত। নিরাপদ কোন মতে অনুরোধ করল আস্তে চালাতে। অম্লান হাসল, 'আস্তে চালাতে কোন মজা নেই দাদা।'

'কিন্তু আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।' আর্তনাদ করল নিরাপদ।

গাড়ির গতি কমাল অম্লান। নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার গাড়িতে লাল আলো কেন হে? শুনেছি মন্ত্রীমশাই, জাজ ছাড়া লাল আলো কোন সাধারণ নাগরিক জ্বালাতে পারে না।'

অম্লান গম্ভীর হল, 'তাহলে আমাকে অসাধারণ নাগরিক মনে করুন।'

বাড়িতে পোঁছে দিল অম্লান। নিরাপদ তাকে নিমন্ত্রণ করল চা খেয়ে যেতে। ওপরে এল ওরা। অদিতি দরজা খুলল। অম্লান তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ? লোডশেডিং-এর কষ্টটা নেই তো?'

অদিতি হাসল, 'না নেই। থ্যাঙ্কস। সে ভেতরে চলে গেল।

নিরাপদ দেখল ওর চলে যাওয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে অম্লান। সেই সময় হৈমন্তী ভেতর থেকে আসছিল। অম্লানের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে সেও লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

সম্বিত এল যেন, অম্লান বলল, 'কিছু না। কেমন আছেন?'

'ভাল। হৈমন্তী স্বামীর দিকে তাকাল, 'সর্বনাশটা হল।'

'কি ব্যাপার?' নিরাপদ জিজ্ঞাসা করল।

'গ্যাস ফুরিয়ে গিয়েছে। দোকানে গিয়েছিলাম। বলল, দিন দশেক লাগবে।'

হৈমন্তী চিন্তিত, 'আগামী পরশু মেয়ের জন্মদিন।

সবাইকে আসতে বলেছি, কি হবে।'

অম্লান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের ডাবল সিলিণ্ডার নেই ?'

নিরাপদ জবাব দিল, 'ডাবল সিলিণ্ডারেই এই দশা।

অম্লান মাথা নাড়ল, 'এটা কোন প্রব্লেমই নয়।'

হৈমন্তী রেগে গেল, 'প্রব্লেম নয় মানে ? কেরোসিন পাওয়া যায় বাজারে ?'

'যায়। দাম বেশী দিতে হয়। কিন্তু বউদি, চিন্তা করবেন না, আপনি গ্যাসই পাবেন। কাল সকালে আপনাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব।'

অম্লানের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল নিরাপদর। যে ইলেকট্রিক এনে দিতে পারে, টিভি সেট পাল্টাতে পারে সে হয়তো গ্যাসও পারবে। একটু বাদে নিরাপদর শ্যালক অবিনাশ এল। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল অম্লানের। অবিনাশ টেড ইউনিয়ন করা মানুষ। সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চাকরি করেন মশাই।'

অম্লান হাসল, 'আমি যে চাকরি করি সেটা সাধারণকে বলা যাবে না।'

'কেন ?'

'নিষেধ আছে।'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা ?'

'টালিগঞ্জে থাকি, এটুকু জানলেই চলে না ?'

'না। চলে না, আপনি কেমন লোক মশাই ? হুট করে ট্রেনের আলাপ সম্বল করে ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন অথচ নিজের পরিচয় কাউকে জানাচ্ছেন না ? এটা কোন ভদ্রতা ?'

নিরাপদ শালাকে সামলালো, 'আহা, নিশ্চয়ই ওঁর অসুবিধা আছে।'

অসুবিধে না ধান্দাবাজি। আপনাকে ফাঁসাবে এই লোকটা।'

অম্লান হাসল, 'আপনি আমাকে অপমান করছেন।

এখানে এখন আপনি আমাকে যা ইচ্ছে করতে পারেন, গায়ের জোরে আমি পারব না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনাকে

কোন কারণ না দেখিয়ে কয়েকমাস জেলের ভাত খাওয়াতে পারি। আচ্ছা বউদি, বলুন তো, আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?

'তা নয়।' আমতা আমতা করল হৈমন্তী।

'আপনার খুব ক্ষমতা, না?' অবিনাশ তেজী গলায় বলল।

'খুব না, সামান্য।'

'আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম গড়িয়ায়। নাইনটি পার্শেণ্ট টাকা জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রমোটার এখন এক্সট্রা এক লাখ চাইছে। এটা সমস্ত রীতিনীতি ভদ্রতার বাইরে। প্রমোটার এখন বেশী দাম পাচ্ছেন বাইরে থেকে। বলছেন হয় আমাকে এক্সট্রা টাকাটা দিতে হবে নয় উনি আমার জমা দেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেবেন। কেস করে কোন লাভ হবে না। কারণ সবাই জানে প্রমোটার ফ্ল্যাট একেবারে সাদা টাকায় বিক্রি করে না। কিছু উপায় হতে পারে?

অম্লান নিরাপদর দিকে তাকাল, দাদা, আপনি কি চান কিছু হোক?'

নিরাপদ নিজের মাথায় হাত বোলালো, 'হওয়া খুব শক্ত। এক এক, পাড়ার ছেলেরা যদি লোকটাকে চাপ দেয় তাহলে—।'

অবিনাশ মাথা নাড়লে, 'সেটা আর সম্ভব নয়। লোকটা ওদের হাত করে ফেলেছে।'

অম্লান এবার হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করল, বউদি আপনি কি চান?'

হৈমন্তী একটু গদগদ গলায় বলল, 'দেখুন না, চেষ্টা করে।'

অম্লান অবিনাশের কাছে ঠিকানা, প্রমোটারের নাম ধাম চাইল। তারপর আগামীকাল কিছু করা যাবে বলে চলে গেল। অদিতি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখল লাগানো গাড়িতে ওঠার আগে অম্লান ওপর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

পরদিন দুপুরে অফিসে অবিনাশের ফোন পেল নিরাপদ। সে খুব উত্তেজিত হয়ে বলল তাকে থানা থেকে পাঠিয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায় ফ্ল্যাট নিয়ে কথা বলা জন্যে। প্রমোটার বোধহয় থানাকেও ম্যানেজ করেছে। জামাইবাবু যদি সঙ্গে আসেন তাহলে সে সাহস পায়।

নিরাপদ স্ত্রীর ভাই-এর দুর্দিনে সঙ্গী হল।

দারোগার সামনে বসেছিলেন প্রমোটর এবং এক ভদ্রলোক। অবিনাশ নিজের পরিচয় দেওয়া মাত্র দারোগা তাকে বসতে বলছেন। প্রাথমিক আলোচনার পর প্রমোটর যখন জিনিষপত্রের বাজারদর বেড়ে যাওয়ার গল্প শোনাচ্ছেন তখন দারোগা স্পষ্ট বলে দিলেন, 'মাসখানেকের মধ্যে যদি আপনি অবিনাশবাবুর হাতে ফ্ল্যাটের চাবি না তুলে দেন তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বেন।

আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না।'

প্রমোটার ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতে চাইলেন না। এবার প্রমোটার প্রস্তাব দিলেন একটু আলাদা করে তার সঙ্গে বসে কথা শুনতে। দারোগা সেটাকেও নাকচ করলেন। এবার প্রমোটারের সঙ্গী ভদ্রলোক কথা বললেন বেশ গম্ভীর গলায়। দারোগা শুনলেন। হেসে বললেন, 'অজিতবাবু, পলিটিক্যাল প্রেসার দিয়ে কোন লাভ হবে না। অর্ডারটা এসেছে এত ওপরতলা থেকে যেখানে আপনারাও পৌঁছতে পারবেন না। এর পরে প্রমোটার দারোগাকে লিখিতভাবে জানালো যে তিনি এক মাসের মধ্যে ফ্ল্যাটের চাবি অবিনাশকে দিয়ে দিবেন।

নিরাপদ তো বটেই অবিনাশেরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ সবই অম্লানের জন্যে হয়েছে বুঝতে অসুবিধ হল না। লোড-শেডিং দূর করা বা টিভি সেট পাল্টানো খুব দারুণ ব্যাপার নয় কিন্তু ফ্ল্যাট পাইয়ে দেওয়া ?

নিরাপদ বাড়িতে ফিরে শুনল হৈমন্তী বেরিয়ে গিয়েছে। অদিতি বলল, দুপুরে অম্লানকাকু ফোন করেছিল। ভবানীপুরের এক গ্যাস ডিলারের কাছে গিয়ে নিরাপদর নাম বললেই নাকি সিলিণ্ডার পাওয়া যাবে। নিরাপদ হতভম্ব। সেই দোকানে তাদের নাম লিস্টে নেই। বললেই দেওয়া যায় নাকি ? কিন্তু হৈমন্তী ফিরে এল একটি কুলিগোছের লোকের সঙ্গে যার হাতে সিলিণ্ডার। পুরোনটা নিয়ে নতুনটা দিয়ে সে চলে যাওয়া মাত্র হৈমন্তী যেন সাতমুখে কথা বলে উঠল, 'তুমি জানো অম্লান কে ?'

'কে ?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করল নিরাপদ।

'ডেপুটি গভর্ণর অফ ওয়েস্টবেঙ্গল। ভাবতে পারো ?'

'যাঃ।'

'হ্যাঁ গো। আমি সেই ডিলারের কাছে গিয়েছিলাম। তোমার নাম শুনে উনি একটি চিরকুট বের করে করলেন। ওদের ওপরতলার এক সাহেব লিখেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি গভর্ণরের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমাকে যেন একটা গ্যাসের সিলিন্ডার এখনই দিয়ে দেওয়া হয়।' হৈমন্তী বসে পড়ল।

'ডেপুটি গভর্ণর? এরকম পোস্ট তো পশ্চিমবাংলায় আছে বলে শুনিনি।'

'আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।'

নিরাপদ বিড় বিড় করল, 'একবার অজয়বাবুর আমলে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার পোস্ট তৈরী হয়েছিল, ডেপুটি প্রাইমমিনিস্টার পোস্ট মাঝে মাঝে হয় কিন্তু ডেপুটি গভর্ণর?' সে উঠে টেলিফোন গাইড দেখে রাজভবনে ফোন করল। রাজভবন জানাল অম্লান মিত্র মামে কাউকে তারা চেনে না। নিরাপদ পরিচিতজনদের ফোন করল। সবাই হাসাহাসি করল ডেপুটি গভর্ণর নামে কোন পোস্ট আছে শুনে। অথচ হৈমন্তী জোর দিয়ে বলছে সে ওই শব্দ দুটো কাগজে দেখেছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় জনাদশেক আত্মীয়স্বজন এল এ বাড়িতে অদিতির জন্মদিন উপলক্ষ্যে। হৈচৈ হচ্ছে। অবিনাশের ছোটভাই বিকাশ থাকে বিরাটিতে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে রাত করতে চাইল না। সে যখন আটটা নাগাদ বের হচ্ছে তখন অম্লান এল লাল আলো জ্বালানো গাড়ি চালিয়ে। এসে বলল, 'দাদা অদিতির জন্মদিনে আমাকেই বাদ দিলেন? তবু অযাচিতের মত এসে পড়লাম।'

অবিনাশ তাকে দেখে খুব খুশী। হৈমন্তীও। সে বলল, 'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না বলে নেমন্তন্ন করতে পারিনি। খুব খুশী হয়েছি এসেছেন বলে।'

তার সঙ্গে বিকাশেরও আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। বিকাশ চলে যাচ্ছে শুনে ব্যস্ত হল অম্লান, 'সেকি, এখন তো সবে সন্ধ্যে, এখনই চলে যাচ্ছেন কেন?'

বিকাশ বলল, 'ফ্ল্যাটে তালাচাবি দিয়ে এসেছি। খুব চুরি হচ্ছে এখন ওপাড়ায়। তাই বেশী রাত করতে চাইনা।'

'এটা কোন প্রব্লেম নয়। ঠিকানাটা বলুন।'

ঠিকানা শুনে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিচু গলায় কিছু বলে এসে অম্লান হাসল, 'নিন, আড্ডা মারুন। দশটা নাগাদ উঠবো।'

'কিন্তু—।' বিকাশ আপত্তি করতে যাচ্ছিল।

অবিনাশ বলল, 'আর কিন্তু করিস না। অম্লানবাবু যখন বলছেন তখন মন ঠিক করে আড্ডা মার! কোন ভয় নেই।'

হঠাৎ অম্লান নিরাপদকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনার জমি কেনা আছে?'

'জমি? না। ওসব আর হয়ে উঠল না।'

হৈমন্তী বলে উঠল, 'একদম বিষয়ী মানুষ নয়। এই ভাড়ার ফ্ল্যাটেই সারাজীবন পচতে হবে।'

অম্লান হাসল, 'তা কেন? আপনি সল্টলেকে পাঁচ কাঠা জমি নিন। স্টেডিয়ামের ঠিক পেছনে। খুব ভাল জায়গা। নেবেন?'

নিরাপদ কিছু বলার আগে অবিনাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'সল্ট-লেকে? ওরে ব্বাস। ওখানে এখন তিনলাখ করে কাঠা।'

নিরাপদ বলল, 'আমাকে বিক্রী করলেও পাওয়া যাবেনা।'

অম্লান হাসল, 'তিনলাখ তো ব্ল্যাক। বারো হাজার করে কাঠা পাবেন। নিয়ে নিন দাদা। ষাট হাজার দিয়ে জমিটা কিনে ফেলুন। ওটাই আইনসঙ্গত দাম। পরে বাড়ি করতে ইচ্ছে না হয় বিক্রী করে দেবেন।'

অবিনাশ উল্লসিত, 'নিয়ে নিন জামাইবাবু। বাড়ি না করলে চোদ্দলাখ চল্লিশ হাজার এখনই প্রফিট। এত লাভ ভাবা যায় না। জমি এখন সোনা।'

অম্লান বলল, ভেবে দেখুন। যদি চান তাহলে একটা চেষ্টা হতে পারে।'

নিরাপদ বলল, 'ভেবে দেখি।'

হঠাৎ অম্লানের যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গীতে সে উঠে অদিতির সামনে এগিয়ে গেল। পকেট থেকে ছোট, প্যাকেট বের করে ওর

হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাপি বার্থ-ডে টু ইউ।' অদিতি বলল, 'থ্যাঙ্কু।'

বিকাশরা চলে গেল নটা নাগাদ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল স্বস্তিতে নেই। নিরাপদই যেতে বলল তাকে। খাওয়া দাওয়া হৈচৈ করতে করতে এদের দশটা বেজে গেল। এক ফাঁকে অম্লান নিরাপদকে বলল, 'দাদা, আপনারা সবাই ভাবছেন আমি কে অথচ আমি সেটা জানাতে পারছিনা। খুব খারাপ লাগে। এবার আমার সঙ্গে আপনাদের দেখা আর ঘনঘন হবে না।'

'সেকি, কেন ?' নিরাপদ অবাক।

'আমাকে মাদ্রাজে বদলি করা হয়েছে। এখনও কিছু দেরি আছে যাওয়ার।'

মন খারাপ হয়ে গেল নিরাপদর। লোকটার পরিচয় অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ওর ব্যবহার তার খুব ভাল লাগে। তাছাড়া অযাচিত উপকারগুলোর কথা ধরলে—! সে বলল, 'আমরা আপনার কাছে শুধু উপকার নিয়ে গেলাম, বদলে কিছুই করলাম না।'

'ছি ছি। আপনি একথা বলছেন কেন ? আমি যা যা করেছি ভালবেসে করেছি। সবাইকে কি খুশী করা যায় ? আমার মাকেই খুশী করতে পারলাম না।'

'কেন ?'

'মা চান আমি বিয়ে করি, সংসারী হই।'

'এতে অসুবিধে কোথায় ?'

'মেয়ে কোথায় ? তেমন মেয়ে না পেলে বিয়ে করে কি লাভ ?'

'কি রকম মেয়ে আপনার পছন্দ ?' সরল গলায় জানতে চাইল নিরাপদ।

এইসময় হৈমন্তী পাশে এসে দাঁড়াল। তার কানেও গেছে শেষ প্রশ্নটা। অম্লান হাসল, 'বউদি যদি রাগ না করেন তাহলে বলতে পারি।'

হৈমন্তী হাসল, 'বাঃ রাগ করব কেন ?'

'তাহলে বলি। ঠিক আপনার মত মেয়ে পেলে বিয়ে করতে পারি।'

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। নিরাপদ হেসে উঠল।

আর তখনই টেলিফোন বাজল। নিরাপদ এগিয়ে গেল সেটা ধরতে। হৈমন্তী বলল, 'আপনি খুব ফাজিল।'

'সত্যি কথা বলেছি বউদি।'

'আমার মত মেয়ের কি অভাব বাংলাদেশে।'

'খুঁজে দিন। আপনাকেই দায়িত্ব দিলাম।'

এইসময় অদিতি এসে দাঁড়াল পাশে, 'মা, দ্যাখো!'

হৈমন্তী দেখল। একটি দামী হাতঘড়ি। সে বলল, 'একি, এত দামী জিনিষ কেন আনলেন।'

'অপরাধ হয়ে গেছে?'

হৈমন্তী জবাব দিতে পারল না। হঠাৎ তার মনে সন্দেহটা এল। অম্লান কি অদিতির জন্যে এসব করছে? তার মতই তো দেখতে অদিতি। প্রথমদিন যেভাবে তাকিয়েছিল মেয়ের দিকে, গাড়িতে ওঠার আগে হাত নাড়া, দামী ঘড়ি উপযাজক হয়ে এসে উপহার দেওয়া—এসব কি তারই ইঙ্গিত? অসম্ভব। এই দুজনের বয়সের পার্থক্য অন্তত আঠারো বছরের। ভাবল বয়সী লোকের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারেনা হৈমন্তী। আর অদিতি কিছুতেই রাজী হবে না তাবত। ওর বন্ধুর দাদারাই পাত্তা পাচ্ছে না।

নিরাপদ ফিরে এল টেলিফোন রেখে, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'কেন?' হাসল অম্লান।

বিকাশ ফোন করেছিল। ও ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্যাখে একটা পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে ওদের ফ্ল্যাটের সামনে। ওর পরিচয় পেয়ে তারা জানায় যে অর্ডার পেয়ে এসেছিল ফ্ল্যাট পাহারা দিতে। কোন বিপদ হয়নি। বিকাশ এসে যাওয়ায় ওরা চলে গেছে। বিকাশ আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছে।'

অবিনাশ ছিল। সে বলল, 'অম্লানবাবু, আপনি কে মশাই? আরব্যরজনীর আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের গল্প শুনেছি, এ যে তার মত ব্যাপার।'

অম্লান হাসল, 'প্রদীপের দৈত্য কিনা জানিনা তবে এসব করলে দেখেছি একসময় যাদের জন্য করছি তাদের কাছে ভীতিকর দৈত্য হয়ে যাই।' তারপর ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বউদি? আমার কথা কিছু ভাবলেন?'

হৈমন্তী বাঁকা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত পারেন আর এটুকু পারেন না ?'

অম্লান হাসল, 'এখানে আমার সঙ্গে প্রদীপের দৈত্যের মিল আছে। পার্থিব জিনিষ আমরা এনে দিতে পারি। কিন্তু দয়ামায়া ভালবাসা পারি না। আপনি তা পারেন।'

'অসম্ভব। আপনার কথা আমি যেটুকু বুঝেছি তাতে কিছুতেই মত দিতে পারছি না।'

'জানতাম।' অম্লান মাথা নাড়ল। তারপর নিরাপদকে বলল, 'চলি দাদা।'

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে হৈমন্তী তার সন্দেহের কথাটা নিরাপদকে জানাল। নিরাপদ চমকে উঠল। অসম্ভব। অদিতি ওর হাঁটুর বয়সী। হৈমন্তী বলল, 'লোকটা এই মতলবে এসেছিল।'

নিরাপদ অবশ্য একমত হল না। ট্রেনে অদিতির কথা ও জানত না।

দুদিন পরে লোডশেডিং হলে, গ্যাস ফুরিয়ে গেলে, জমি কেনার কথা মনে হলে হৈমন্তী নিরাপদর খুব কষ্ট হত। তাদের মনে হত অদিতিকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এখন সেটা করে কোন লাভ নেই। অম্লান সম্ভবত মাদ্রাজে চলে গিয়েছে। হয়তো সেখানে কোন দাদা বউদি পেয়ে তাদের উপকার করছে। হৈমন্তী সেটা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়।

—